প্রকৃতিতত্ত্বের নানান রূপ

BANGLADARSHAN.COM

পম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়

॥উৎসর্গ॥

গুরুর চরণধূলি নিয়ে
মনমুকুর মালিন্যমুক্ত,
জগন্মাতার মহিমা গাই
সন্তান তাঁর অনুরক্ত।

“সদ্গুরুরূপী ঈশ্বরী শ্রীশ্রীমা সর্বাণীর পুতরাঙাপাদপদ্মে এই গ্রন্থটি নিবেদিত হল মাতৃচরণাশ্রীতা পম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়ের, যে জগৎজননীর সতত কৃপা ও অমৃতকরুণাধারা ব্যতীত আমার লেখা সম্ভবই ছিল না।

জয় শ্রীশ্রী মা সর্বাণী, জয় গুরুমহারাজগণ।

BANGLADARSHAN.COM

সূচিপত্র

গল্পের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
কালীতত্ত্ব-প্রথম পর্ব	৪
কালীতত্ত্ব-দ্বিতীয় পর্ব	৮
কালীতত্ত্ব-তৃতীয় পর্ব	১২
চৌষট্টি যোগিনী-প্রথম পর্ব	১৮
চৌষট্টি যোগিনী-দ্বিতীয় পর্ব	৩৫
চৌষট্টি যোগিনী-তৃতীয় পর্ব	৪৩
রাধাকৃষ্ণের রাসলীলার তাৎপর্য	৫৫

BANGLADARSHAN.COM

॥কালীতত্ত্ব॥

প্রথম পর্ব:-

সাধক কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের এই গানে লিখেছেন,

ব্রহ্মময়ী সনাতনী সাকার রূপিণী
নিত্যকালী নিরাকারা নীরদবরণী।
মহেশ্বরী মহামায়া মহেশ মোহিনী
যজ্ঞেশ্বরী যোগমায়া জগৎ জননী।
বরদা বগলা বামা বরপ্রদায়িনী
অন্নপূর্ণা শুভঙ্করী ত্রিশূলধারিণী
চন্ডিকা চামুন্ডা দানবঘাতিনী,
দশভুজা কাত্যায়নী নগেন্দ্রনন্দিনী।

যিনি ব্রহ্ম তিনিই ব্রহ্মময়ী, শিব আর শক্তি যে অভেদ। সেই ব্রহ্মময়ী সনাতনী সর্বব্যপিনী পরমাপ্রকৃতি সত্তাই যে কালকে নিয়ন্ত্রণ করছেন, তাই তিনি কালী। মায়ায় আবৃত করে জগৎ প্রপঞ্চ যিনি নিয়ন্ত্রণ করছেন তিনিই কালীরূপে সাকার মহামায়া, চালিকা সচল শক্তি আবার তিনি যখন মায়ারহিত হয়ে জগতের নিরাকার নীরদে বিন্দুরূপে ঘটে ঘটে বিরাজ করে যোগযুক্ত হচ্ছেন তখন তিনি যোগমায়া। দুইই অভেদ, মহামায়া হরাইজোন্টাল ব্যাপীকা শক্তি যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃশ্যমান জগতে ছড়িয়ে আছে আর যোগমায়া আছেন আড়াই প্যাঁচে দেহ অভ্যন্তরে যাঁর চলন সুষুম্না মার্গে।

কালী মূর্তির রহস্য ও তার তাৎপর্য:-

****

কালিকা, দশমহাবিদ্যার প্রথমা বিদ্যা, তাই আদ্যাশক্তি নামে খ্যাতা। অতীব নিগুঢ় রহস্যাবৃত পরমব্রহ্মের এই স্বরূপটি। জেনেও যাকে জানা যায় না, সুগভির দার্শনিক তত্ত্বে মোরা এর স্বরূপ। কাল+ঈ=কালী। কাল শব্দে মৃত্যু বা সময়, ঈ অর্থে ঊর্ধ্বে। যিনি কালের ঊর্ধ্বে তিনিই কালী। মায়ের চরণাশ্রিত হলে সাধকের আর মৃত্যুভয় থাকে না। মা'র কৃপা কটাক্ষে সে মৃত্যু সাগর হতে অমৃতরাজ্যে উপনীত হয়। তিনি কালাকালের নিয়ন্ত্রী। যে মহাকাল জগৎ সংহার করেন, প্রলয়কালে কালী সেই মহাকালকেও 'কলন' অর্থাৎ গ্রাস করেন.....
"মহাক:লস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা।" আদি অন্তহীনা পরাৎপর পরমব্রহ্মকালী কালাকালের অতীত।
দেবী কৃষ্ণবর্ণা বা নীলববর্ণা-"কৃষ্ণবর্ণা সদা কালী আগমস্যেতি নির্ণয়:~ কামাক্ষা তন্ত্রের এই বচনানুসারে কালিকা কৃষ্ণবর্ণা বা কালো। বিশ্বব্যাপী তমোময় অজ্ঞানের অন্ধকারকে নিজের মধ্যে তিনি আকর্ষন করছেন। আবার যত বর্ণ বা রঙ আছে সবকটিকে একত্রে মিশ্রিত করলে কালোরঙ হবে। তেমনি মা সর্ব বর্ণময়ী।

শ্বেতপীতাদিকো বর্ণে যথা কৃষ্ণে বিলীয়তে।

প্রবিশন্তি তথা কাল্যাং সর্ব্বভূতানি শৈলজে।।
অতস্তস্যাঃ কালশক্তের্নির্গনায়া নিরাকৃতেঃ।

হিতায়া: প্রাপ্তযোগানাং বর্ণঃ কৃষ্ণো নিরূপিতঃ। ~মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

১৩|৫-৬
পরাশক্তি অরূপা তাই বর্ণহীন। সুতরাং যেখানে সর্ব বর্ণের অভাব সেখানেই নিবিড় কৃষ্ণবর্ণের প্রাদুর্ভাব। কোথাও কোথাও মাকে নীলবর্ণাও বলা হয়েছে। নীলবর্ণ অনন্তের প্রতীক। অনন্ত মহাকাশকে দূর থেকে নীল দেখায়, কিন্তু আসলে তা বর্ণহীন। আবার নীলবর্ণ কৃষ্ণবর্ণও বটে, কারণ শিব ও শিবার ব্যোমরূপ বলে তাদের বর্ণ অসিত অর্থাৎ কালো।

শিবয়োর্যোমরূপত্বাসিতং লক্ষ্যতে বপুঃ।
~কপূরাদিস্তোত্র ১ম শ্লোকের স্বরূপব্যাখ্যা, পাদটিকা।
ঋগ্বেদে উক্ত আছে সৃষ্টির আদিতে তমঃ ছিলো।
তম আসিত্তমসা গুঢ়মগ্রে ~ঋক্ বেদ ১০/১২৯/৩।

কালী দিগম্বরী-কালী দিগম্বরী, বস্ত্র আবরণ। সবথেকে সুক্ষ্ম আবরণ মায়া। কালী পূর্ণব্রহ্ম তাই মায়াতীতা, তাই দিগম্বরী। তিনি লজ্জা ঘৃণা কুল শীল মান জুগুপ্সাদি অষ্টপাশ থেকে মুক্ত। তিনিই একমাত্র সত্য, আর সত্য চিরকাল অনাবৃত।

কালী মুক্তকেশী-কালী মায়াতীতা কিন্তু অনন্তকোটি জীবকুলকে নিত্য মায়াপাশে বদ্ধ করছেন। আবার তিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে মুক্তি প্রদান করেন তাই মুক্তকেশী।

মহাকল্পতরুঃ কালী অনিরুদ্ধসরস্বতী।
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানাং ভুক্তিযুক্ত্যেককারণম্॥

নিরুত্তর তন্ত্র।

তিনি মহামায়া, তিনি মায়াপাশে আবদ্ধ করেন আবার তিনিই মায়ামুক্ত করেন। আবার এইভাবেও বলা যায় কেশ বিন্যাসাদি বিলাস-বিকার।। কালী পরমব্রহ্ম তাই নির্বিকার।

কপালে অর্ধচন্দ্র-নিত্যায়াঃ কালরূপায়াঃ অব্যয়ায়াঃ শিবাত্মনঃ। অমৃতত্বাল্ললাটেহস্যাঃ শশিচিহ্নং নিরূপিত। ~মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ১৩/৭

চন্দ্র হতে ক্ষরিত হয় অমৃত। চন্দ্রকলা অমৃতত্ত্বের প্রতীক। কালী অমৃতত্ত্ব অর্থাৎ নির্ব্বাণ মোক্ষ প্রদান করেন। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সন্তানকে আপন ব্রহ্মাণ্ডব্যাপণী সত্বায় আত্মস্যাৎ করে পরমকাঙ্খিত মোক্ষপদ প্রদান করেন।
কালির দন্তপঙক্তি ও লোলজিহ্বা-কালীর শুভ্র দন্তপঙক্তি সত্ত্বগুনের প্রতীক। আর রক্তলাল জিহ্বা রজোগুণ। সেই দন্তসমুহ দ্বারা তিনি পন জিহ্বা দংশন করে আছেন। শুদ্ধ সত্ত্ব দ্বারা রজোগুণকে দমন করেন। আবার জিহ্বা বাকশক্তির প্রতীক, এতে বা সংযমকেও নির্দেশিত করে। যে জিহ্বা দিয়ে তার নাম গুণগান করা উচিৎ, অযথা বাক্যব্যায়ে সেই জিহ্বা নিয়োজিত।

আবার জিহ্বা স্বাদেন্দ্রিয়ও বটে। জিহ্বা দ্বারা আমরা খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করি, এটি লালসা বা লোভকে প্রভাবিত করে। তাই কঠিন দন্তরাজি দ্বারা তিনি লালসারূপ জিহ্বাকে দংশন করছেন।

কালী করাল-বদনা-কালী শব্দে কাল.....ঈ বুঝায়। অর্থাৎ অনাদি অনন্ত মহাকাল.....ঈ, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান রূপী মহাকালের সাথে যুক্ত ব্রহ্মশক্তিই কালিকা। মহাকাল সৃষ্টিকে কলন অর্থাৎ গ্রাস করছেন বা কালগ্রস্ত করছেন। কিন্তু সেই করাল ভয়ঙ্কর মহাকালকেও যিনি কলন বা গ্রাস করেন তিনিই করালবদনা কালী। উদ্ভিজ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ রূপে তিনি নিত্য তার সৃষ্টি স্থিতি এ সংহার লীলা অব্যাহত রেখেছেন। করালবদন কঠোরতারও প্রতীক। অসুর দলনে মার মুখকমল নিষ্ঠুরতায় পূরণ, আবার অসুরগণকে কৃপা-পরবশ হয়ে নিধনের মাধ্যমে মুক্তি বিধান করছেন। একাধারে করুণা ও নিষ্ঠুরতার যুগ্ম সমন্বয়।

চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা।
ত্বয্যেব দেবী বরদে ভুবনত্রয়োঽপি॥ শ্রীশ্রীচণ্ডী ৪/ ২২

অর্থাৎ... “হে দেবী তোমার চিত্তে অনির্ব্বচনীয় কোমলতাপূর্ণ কৃপা ও বাহিরে নিষ্ঠুরতার ভীষণ প্রকাশ, এই অপূর্ব স্বভাব কেবল তোমাতেই পরিলক্ষিত হয়। তুমি ত্রিভুবনের বরপ্রদাত্রী।” মা গুণাতীতা আবার গুণময়ীও বটে, তাই অসুর সংহারে প্রবৃত্ত হয়ে ক্রোধাতুরা হয়েও ঈষৎ হাস্যমুখী। করালবদনা আবার স্মরানন সরোরুহা।। আবার এভাবেও বলা যায়, আসুরিক বৃত্তি সম্পন্ন মানুষের বুদ্ধি তমসাচ্ছন্ন। ইন্দ্রিয়তাড়িত হয়ে সে সর্ব্বদা ছুটে মরছে। মোহগ্রস্ত হয়ে মায়াময় এই জগৎ ও জীবনের সকল ঘাত প্রতিঘাত তার কাছে সবসময় ভীতিপ্রদ। মৃত্যু তার কাছে আতঙ্কের কারণ। তাই আপেক্ষিক অর্থে মা তার সকাসে করালবদনা ঘোর ভয়ঙ্করী। কারণ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড রূপিনী মাকে সে ওই রূপেই দেখে।

আবার সদ্গুরুর কৃপায় যার মোহ নাশ হয়েছে, চিত্ত নির্মল ও বুদ্ধি বিকার রহিত হয়েছে, জীবন ও মৃত্যু দুই তার কাছে আনন্দদায়ক। ‘সুখ ও দুঃখে নির্ব্বিকা’ সেই সাধকের কাছে মা হলেন সদাহাস্যময়ী উত্তাল এক চির আনন্দ সমুদ্র।

কালীর ত্রিনয়ন- মা “বার্কশশিনেত্র” চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি মায়ের তিনটি নয়ন। ত্রিভুবনের সকল ভুত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সর্ব্বদা মায়ের ত্রিনয়নে প্রতিভাত হচ্ছে। কালী তন্ত্রশাস্ত্র প্রতিপাদ্যা আবার যোগাধিগম্যা। তন্ত্রে ও যোগে যে ষটচক্রের উল্লেখ আছে, তার মধ্যে ললাটস্থিত আজ্ঞাচক্রই মায়ের ত্রিনয়ন। আজ্ঞাচক্র দ্বিদল বিশিষ্ট কার চক্র। ভ্রূ-দ্বয়ের পিছনে ও ঠিক মধ্যস্থলে কুটস্থ বিন্দুতে এর অবস্থান। এর বাম দিকের চন্দ্রাধার দলে চন্দ্রাত্মক ‘হং’ বীজ থেকেই কালীর বাম নয়ন, দক্ষিণ দিকের সূর্য্যাধার দলে সূর্য্যাত্মক ‘ক্ষং’-বীজ থেকে দক্ষিণ নয়ন এবং আজ্ঞাচক্র-কমশেরকর্ণিকারূপ অগ্ন্যাধার-স্থিত অগ্ন্যাত্মক ‘রং’-বীজ থেকেই উক্ততেজঃ বা জ্ঞানাগ্নিদীপ্ত ত্রিনয়ন যথাক্রমে চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিরূপে কালীর অব্যক্ত নয়নত্রয়ে উদ্ভাসিত হয়েছে।

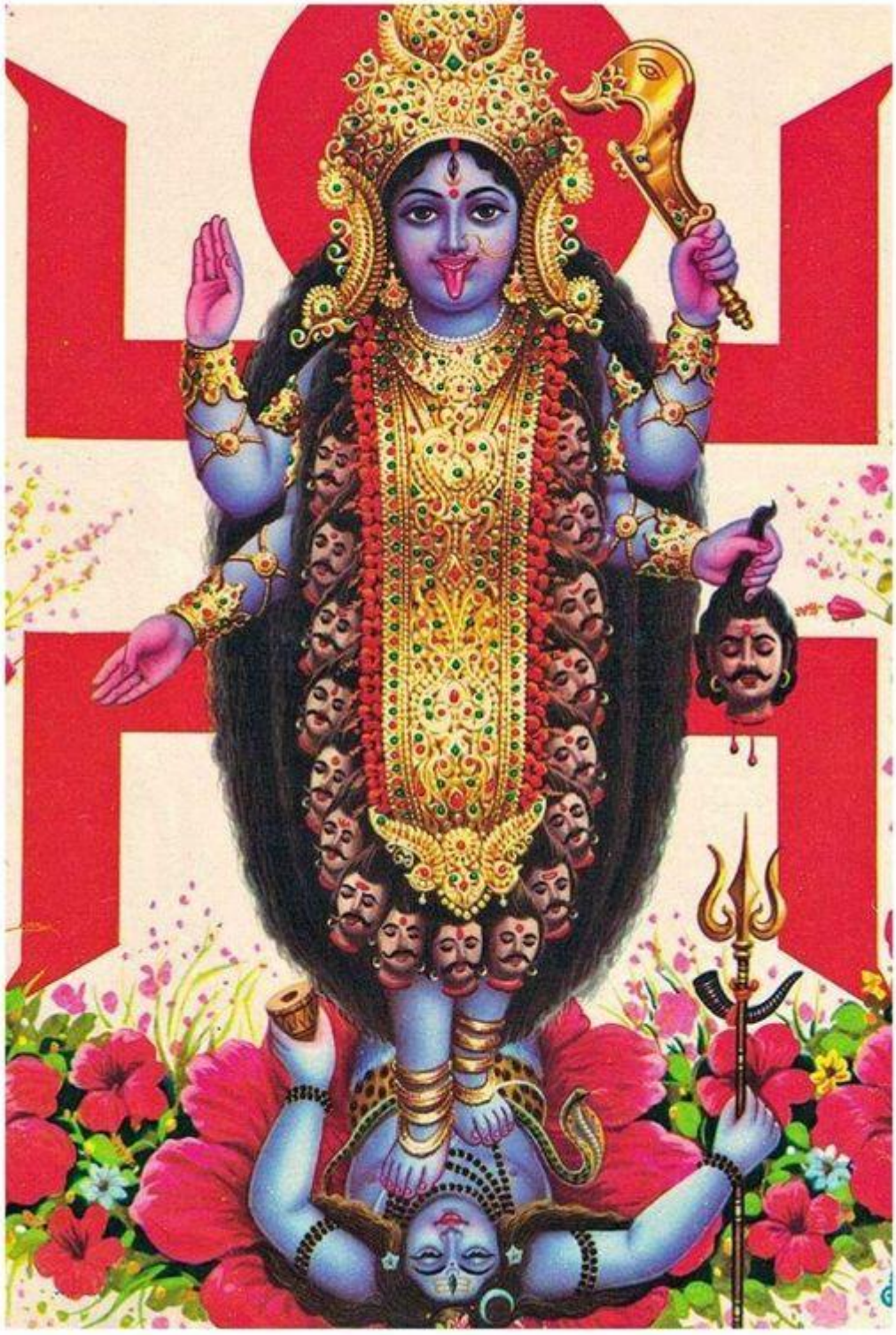

॥দ্বিতীয় পর্ব॥

কালী বিগলিতরুধিরগণ্ড-রক্তধারা রজোগুণের প্রতীক, তিনি রজোরহিতা, শুদ্ধসত্ত্বাত্মিক । আবার রক্ত প্রাণ শক্তি বা জীবনীশক্তির প্রতীক। মা হলেন অনন্ত জীবন.....পরাৎপর পরমব্রহ্ম পরমাত্মা।

এই পরমাত্মা কালী হতে রক্তধারা-জীবাত্মা নির্গত হচ্ছে।

মুন্ডমালা-অসুরে তমসাচ্ছন্ন বুদ্ধি মাথাতেই সঞ্চিত থাকে। তাই মা আসুরিক বুদ্ধিকে ছিন্ন করে নিজ দৈবিসত্ত্বায় পরিপূর্ণতা দিয়ে আপন কণ্ঠভূষণ করেছেন। আবার যোগবাশিষ্টের নির্বাণ প্রকরণ ও কপূরাদিস্তবের টীকাকারগণের মতে আগামী সৃষ্টির জন্য পূর্ব সৃষ্টির সংস্কার মূলমায়াকে মালা করা হয়েছে। আবার তন্ত্র বলেন, 'পঞ্চাশৎ বর্ণমুণ্ডালী।' এই পঞ্চাশটি মুণ্ডমালা অ হইতে ক্ষ পর্যন্ত পঞ্চাশটি বর্ণের প্রতীক। কালী সর্ব্ব বর্ণময়ী। কবির ভাষায়....

"যত শুন কর্ণপুটে,
সবই মায়ের মন্ত্র বটে।
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী
বর্ণে বর্ণে রূপ ধরে॥" এই বর্ণময় মুন্ডসকল মায়ের অনন্তকোটি বিভূতির প্রকাশ।

কালীর হস্তচতুষ্টয় ও আয়ুধ সকল-কালীর বহুতর ধ্যানে তার হাতের বিভিন্ন বর্ণনা আছে, কোথাও দশভূজা, কোথাও অষ্টভূজা আবার কোথাও বা ষোড়শভূজা। কিন্তু সাধারণত কালীকে আমরা চতুর্ভূজা দক্ষিণকালিকা রূপেই দেখে থাকি। দেবীর চতুর্ভূজা রূপের ব্যাখ্যা এইভাবে করা হয়.......প্রত্যেক বৃত্তে ৩৬০° ডিগ্রি আছে। বৃত্তটিকে ৯০° ডিগ্রি করে চারভাগে বিভক্ত করলে এই চারটি ভাগ বৃত্তের চতুর্ভুজ। এর অর্থ পূর্ণবৃত্ত চতুর্ভুজ। কালী পূর্ণব্রহ্ম, তিনি মহাকাশরূপিনী। দক্ষিণকালীর আয়ুধ-চতুষ্টয় যথাক্রমে-খড়্গ, মুণ্ড, বর ও অভয়।

উর্ধ্ব বামকরে খড়্গ-এই খঙ্গ হল জ্ঞান খড়্গ। অজ্ঞানীর জীবনে ষড়রিপু ও তামসিকতার আধিক্য দেখা যায়। মোহ থেকে অজ্ঞান আসে আর অজ্ঞানের অন্ধকারে তামসিকতার আবির্ভাব ঘটে। তাই মা জ্ঞানরূপ শানিত খড়্গ দিয়ে মোহরূপ অজ্ঞানকে ছিন্ন করছেন। বাম অর্থে বিপরীত, অজ্ঞানের বিপরীত হল জ্ঞান।

হয়তো এই কারণেই দেবীর বামকরেই খড়্গের অবস্থান কল্পনা করা হয়েছে। ঠিক একই ভাবে অধঃবাম করে মুণ্ডের অবস্থান চিন্তা করা হয়েছে। প্রকৃতির বিপরীত আচরনকারি তথা আসুরিক বৃত্তি অবলম্বনকারিরা অবশ্যই বিনাশ প্রাপ্ত হবে। আবার এই মুণ্ডহস্তকে এভাবেও বর্ণনা করা যায়......মুণ্ড জ্ঞানের আধার। মানুষের জ্ঞান তার মস্তকেই সঞ্চিত থাকে। জ্ঞান থেকে চৈতন্যের উদয় হয়। চৈতন্যময় সাধক সতত নিরাসক্ত ও মোহমুক্ত হয়ে ভগবতীর চরণে নিজেকে সমর্পন করে দেয়। এবং এইরূপ সাধককে মা কখনো হাতছাড়া করেন না।

কালীর উর্ধ্ব দক্ষিণ-করে (উপরের ডানহাতে) অভয়মুদ্রা ও অধঃ দক্ষিণ-করে (নীচের ডান হাতে) বরমুদ্রা।

এর ব্যাখ্যা অনেকটা এইরূপ.....দেবী সকাম সাধককে অভয় ও অভীষ্ট বর প্রদান করেন। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে অভয় ও বর সম্বন্ধে বলা হয়েছে, সময়ে সময়ে যখন বিপদ আসে তখন জীবকুলকে বিপদ থেকে রক্ষা করা হল অভয়, আর তাদের স্ব স্ব কর্মে প্রেরণ করাই হল বর। সময়ে সময়ে জীবরক্ষণং বিপদঃ শিবে।
প্রেরণং স্বস্বকার্যেষু বরশ্চাভয়মীরিত। ~মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ১৩/১০

কালীর পদসংস্থান-তন্ত্রে বামাকালী ও দক্ষিণাকালী উভয়েরই বর্ণনা আছে, পার্থক্য শুধু এই যে বামাকালীর বামপদ শবের বুকে আর দক্ষিণকালীর ডান পা শবের বুকে। দেবী বাম পদ সামনে বাড়িয়ে দাঁড়ালে তাকে বলা হয় আলীপদা এবং দক্ষিণপদ বা ডান পা সামনে বাড়িয়ে দাড়ালে তাকে বলা হয় প্রত্যালীঢ়পদা..

আলীঢ়ং বামপাদন্তু প্রত্যালীন্তু দক্ষিণ...
আলীপাদা সা দেবী প্রত্যালীঢ় ক্ষণে ক্ষণে।
অনন্তরূপিণীং শ্যামাং কো বকুং শক্যতে প্রিয়ে॥

~~গুপ্তসাধনতন্তু, পৃ ৬
এক পা অতীতে এবং এক পা ভবিষ্যতে রেখে কালাকালের অধিষ্ঠাত্রী দেবী দাঁড়িয়ে আছেন। কালীর নরহস্ত-কাঞ্চী-দেবী কালিকার কটিদেশে শবহস্তনির্মিত কাঞ্চী বিদ্যমান। হাত মানুষের কর্মের প্রধাণ অঙ্গ। তাই হাতকে কর্মের প্রতীক বলা যায়। কল্পান্তে জীবসকল তাদের স্থূলদেহ ত্যাগ করে নিজ নিজ কর্মসহ লিঙ্গদেহ আশ্রয় করে এবং সগুণব্রহ্মরূপিনী কালীর কারণদেহের অবিদ্যাময় অংশে পুনরায় কল্পারম্ভ পর্যন্ত অবস্থান এবং মোক্ষলাভ না হওয়া পর্যন্ত জীবকে বার বার এইভাবে অবস্থান করতে হয়। এইজন্য মৃত জীবদের কর্মপ্রধান অঙ্গ.....হস্তসমুহের দ্বারা নির্মিত কাঞ্চী মায়ের গর্ভধারণসক্ষম নিম্নোদর তথা যোনির ঊধ্বস্থিত কটিদেশে কল্পিত হয়েছে। জীব কর্মের দ্বারা জাত হয়, কর্মের দ্বারাই বিলীন হয়। দেহ বিনষ্ট হলে সেই কর্ম আবার নূতন দেহে সংযুক্ত হয়। যথা.....

কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে।
দেহে বিনষ্টে তৎকর্ম্ম পুনর্দেহে প্রলভ্যতে॥
জ্ঞানভাষ্যবচন, শারদা তিলক ১ম উঃ।

জীবসকলকে আপনার সাথে সংযুক্ত রাখা ও জন্ম মৃত্যু মোক্ষলাভের ঘটনা পরম্পরাকে অব্যাহত রাখাই এই মৃত হস্ত কাঞ্চীর তত্ত্ব।

শববক্ষস্থিতা-কালী শব বক্ষস্থিতা। শব নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতীক। এখানে শব শব্দের দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্মকে নির্দেশ করা হয়। যথা,গায়ত্রীতন্ত্রে.....শব ইত্যক্ষরে ব্রহ্মবাচকঃ প্রেতনির্ণয়ঃ।..গায়ত্রী তন্ত্র, ১ম পরিঃ, ব্রাহ্মণ পটল।
পরমশিব শুদ্ধ চিৎস্বরূপ, নির্গুণ ব্রহ্ম। তিনি নিষ্ক্রিয়, শবও নিষ্ক্রিয়। অতএব শব নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতীক। পরশিব ও পরাশক্তি অভিন্ন। যিনি স্বরূপতঃ নির্গুণ ব্রহ্ম, তিনিই সগুণ ব্রহ্মরূপে গুণময়ময়ী কালী.....
সৃসটিস্থিতিপ্রলয়কারিণী আদ্যাশক্তি। দেবীর এইরূপ কল্পনায় সাঙ্খের পুরুষ প্রকৃতি তত্ত্ব রয়েছে। সাংখ্যমতে পুরুষ নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতি ক্রিয়াশীল। প্রকৃতি থেকেই সৃষ্টিস্থিতি ও লয়। তিনিই ব্রহ্মের অঘটন ঘটন পটিয়সী শক্তি। আবার অভেদ তত্ত্বহতু ব্রহ্মই শক্তি। আবার প্রকৃতি চৈতন্যময়ী হলেও তা জড়.....পুরুষের সান্নিধ্য ব্যতীত তিনি কিছু করতে পারেন না। উপরন্তু জগদব্যপারে প্রকৃতিরই কর্তৃত্ত্ব। কিন্তু তন্ত্রে এই বিষয়ে সাংখ্যমত অবিকল অনুসৃত হয়নি। তন্ত্রে প্রকৃতিই বা শক্তিউভই সৃষ্টিকার্য নির্ধ্বাহের জন্য পুরুষ রূপ (নিগুণ ব্রহ্মস্বরূপ) ধারণ করেন.....

নিমিত তমাত্রং দ্রুহ্মং সর্ব্বকারণ করণ। সেই পরম ব্রহ্ম কালী লীলাবিলাস হেতু দ্বিবিধ হয়েছেন।

ওঁ খড়্গং চক্রগদেষুচাপপরিঘান শূলং ভুসূণ্ডিং শিরঃ
শঙ্খং সন্দধতীং করৈস্ত্রিনয়নাং সর্বাঙ্গভূষাবৃতাম্॥
নীলাশ্মদ্যুতিমাস্যপাদদশকাং সেবে মহাকালিকাম্
যামস্তৌচ্ছয়িতে হরৌ কমলজো হন্তুং মধুং কৈটভম্॥

-মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর প্রথম চরিত্র শ্রী শ্রী মহাকালীর ধ্যানমন্ত্রে পাওয়া যায়। তন্ত্রশাস্ত্রের মতে, তিনি দশমহাবিদ্যা নামে পরিচিত তন্ত্রমতে পূজিত প্রধান দশ জন দেবীর মধ্যে প্রথম দেবী। শাক্তরা কালীকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির আদি কারণ মনে করে। বাঙালি হিন্দু সমাজে দেবী কালীর মাতৃরূপের পূজা বিশেষ জনপ্রিয়।

পুরাণ ও তন্ত্র গ্রন্থগুলিতে কালীর বিভিন্ন রূপের বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে সাধারণভাবে তাঁর মূর্তিতে চারটি হাতে খড়্গ, অসুরের ছিন্নমুণ্ড, বর ও অভয়মুদ্রা; গলায় মানুষের মুণ্ড দিয়ে গাঁথা মালা; বিরাট জিভ, কালো গায়ের রং, এলোকেশ দেখা যায় এবং তাঁকে তাঁর স্বামী শিবের বুকের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।

ব্রহ্মযামল মতে, কালী বঙ্গদেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কালীর বিভিন্ন রূপভেদ আছে। যেমন-দক্ষিণাকালী, শ্মশানকালী, ভদ্রকালী, রক্ষাকালী, গুহ্যকালী, মহাকালী, চামুণ্ডা ইত্যাদি। আবার বিভিন্ন মন্দিরে “ব্রহ্মময়ী”, “ভবতারিণী”, “আনন্দময়ী”, “করুণাময়ী” ইত্যাদি নামে কালীপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা ও পূজা করা হয়। আশ্বিন মাসের অমাবস্যা তিথিতে দীপান্বিতা কালীপূজা বিশেষ জাঁকজমক সহকারে পালিত হয়। এছাড়া মাঘ মাসে রটন্তী কালীপূজা ও জ্যৈষ্ঠ মাসে ফলহারিণী কালীপূজাও বিশেষ জনপ্রিয়। অনেক জায়গায় প্রতি অমাবস্যা এবং প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবারে কালীপূজা হয়ে থাকে।

BANGLADARSHAN.COM

॥তৃতীয় ও শেষ পর্ব॥

পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতায় অনেক কালীমন্দির আছে। তাই ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে কালীকে "কলকাত্তাওয়ালি" (কলকাতানিবাসী) বলা হয়। কলকাতার সবচেয়ে বিখ্যাত কালীমন্দিরটি হল কালীঘাট মন্দির। এটি একটি সতীপীঠ। এছাড়া দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি, আদ্যাপীঠ, ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি, ফিরিঙ্গি কালীবাড়ি ইত্যাদি কলকাতা অঞ্চলের বিখ্যাত কয়েকটি কালী মন্দির। এছাড়া লালনার সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ি, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ময়দা কালীবাড়ি, উত্তর চব্বিশ পরগনার হালিশহরের রামপ্রসাদী কালী মন্দির ইত্যাদি পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত কয়েকটি কালীমন্দির। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরের অধুনা ধ্বংসপ্রাপ্ত রমনা কালীমন্দির ছিল খুবই প্রাচীন একটি কালীমন্দির। ভারতের রাজধানী নতুন দিল্লির নতুন দিল্লি কালীবাড়ি একটি ঐতিহ্যপূর্ণ কালীমন্দির।

'কালী' শব্দটি 'কাল' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ রূপ, যার অর্থ 'কৃষ্ণ, ঘোর বর্ণ' (পাণিনি ৪।১।৪২)। মহাভারত অনুসারে, এটি দুর্গার একটি রূপ (মহাভারত, ৪।১৯৫)। আবার হরিবংশ গ্রন্থে কালী একটি দানবীর নাম (হরিবংশ, ১১৫৫২)।

কাল, যার অর্থ 'নির্ধারিত সময়', তা প্রসঙ্গক্রমে 'মৃত্যু' অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এর সমোচ্চারিত শব্দ 'কালো' র সঙ্গে এর কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। কিন্তু লৌকিক ব্যুৎপত্তির দৌলতে এরা পরস্পর সংযুক্ত হয়র গেছে। মহাভারত-এ এক দেবীর উল্লেখ আছে যিনি হত যোদ্ধা ও পশুদের আত্মাকে বহন করেন। তাঁর নাম কালরাত্রি বা কালী। সংস্কৃত সাহিত্যের বিশিষ্ট গবেষক টমাস কবার্নের মতে, এই শব্দটি নাম হিসাবে ব্যবহার করা হতে পারে আবার 'কৃষ্ণবর্ণা' বোঝাতেও ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে।

রূপভেদ:

তন্ত্র ও পুরাণে দেবী কালীর একাধিক রূপভেদের কথা পাওয়া যায়। তোড়ল তন্ত্র মতে কালী অষ্টধা বা অষ্টবিধ। যথা-দক্ষিণাকালী, সিদ্ধকালী, গুহ্যকালী, মহাকালী, ভদ্রকালী, চামুণ্ডাকালী, শ্মশানকালী ও শ্রীকালী। মহাকাল সংহিতা অনুসারে আবার কালী নববিধা। এই তালিকা থেকেই পাওয়া যায় কালকালী, কামকলাকালী, ধনদাকালী ও চণ্ডিকাকালীর নাম।

দক্ষিণাকালী:

দক্ষিণাকালীর কালীর সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ মূর্তি। ইনি প্রচলিত ভাষায় শ্যামাকালী নামে আখ্যাতা। দক্ষিণাকালী করালবদনা, ঘোরা, মুক্তকেশী, চতুর্ভূজা এবং মুণ্ডমালাবিভূষিতা। তাঁর বামকরযুগলে সদ্যছিন্ন নরমুণ্ড ও খড়্গ; দক্ষিণকরযুলে বর ও অভয় মুদ্রা। তাঁর গাত্রবর্ণ মহামেঘের ন্যায়; তিনি দিগম্বরী। তাঁর গলায় মুণ্ডমালার হার; কর্ণে দুই ভয়ানক শবরূপী কর্ণাবতংস; কটিদেশে নরহস্তের কটিবাস। তাঁর দন্ত ভয়ানক; তাঁর স্তনযুগল উন্নত; তিনি ত্রিনয়নী এবং মহাদেব শিবের বুকে দণ্ডায়মান। তাঁর দক্ষিণপদ শিবের বক্ষে স্থাপিত। তিনি মহাভীমা, হাস্যযুক্তা ও মুহুর্মুহু রক্তপানকারিনী। দক্ষিণাকালী-কালো রূপে দিগম্বরী শ্যামা মা, এই কালীকেই বলছেন রামপ্রসাদ।

তাত্ত্বিকের তাঁর নামের যে ব্যাখ্যা দেন তা নিম্নরূপ: দক্ষিণদিকের অধিপতি যম যে কালীর ভয়ে পলায়ন করেন, তাঁর নাম দক্ষিণাকালী। তাঁর পূজা করলে ত্রিবর্ণা তো বটেই সর্বোপরি সর্বশ্রেষ্ঠ ফলও দক্ষিণাস্বরূপ পাওয়া যায়।

সিদ্ধকালী:

সিদ্ধকালী কালীর একটি অখ্যাত রূপ। গৃহস্থের বাড়িতে সিদ্ধকালীর পূজা হয় না; তিনি মূলত সিদ্ধ সাধকদের ধ্যান আরাধ্যা। কালীতন্ত্র-এ তাঁকে দ্বিভূজা রূপে কল্পনা করা হয়েছে। অন্যত্র তিনি ব্রহ্মরূপা ভুবনেশ্বরী। তাঁর মূর্তিটি নিম্নরূপ: দক্ষিণহস্তে ধৃত খড়্গের আঘাতে চন্দ্রমণ্ডল থেকে নিঃসৃত অমৃত রসে প্লাবিত হয়ে বামহস্তে ধৃত একটি কপালপাত্রে সেই অমৃত ধারণ করে পরমানন্দে পানরতা। তিনি সালংকারা। তাঁর বামপদ শিবের বুকে ও বামপদ শিবের উরুদ্বয়ের মধ্যস্থলে সংস্থাপিত।

গুহ্যকালী:

গুহ্যকালী বা আকালীর রূপ গৃহস্থের কাছে অপ্রকাশ্য। তিনি সাধকদের আরাধ্য। তাঁর রূপকল্প ভয়ংকর: গুহ্যকালীর গাত্রবর্ণ গাঢ় মেঘের ন্যায়; তিনি লোলজিহ্বা ও দ্বিভূজা; গলায় পঞ্চাশটি নরমুণ্ডের মালা; কটিতে ক্ষুদ্র কৃষ্ণবস্ত্র; স্কন্ধে নাগযজ্ঞোপবীত; মস্তকে জটা ও অর্ধচন্দ্র; কর্ণে শবদেহরূপী অলংকার; হাস্যযুক্তা, চতুর্দিকে নাগফণা দ্বারা বেষ্টিতা ও নাগাসনে উপবিষ্টা; বামকঙ্কণে তক্ষক সর্পরাজ ও দক্ষিণকঙ্কণে অনন্ত নাগরাজ; বামে বৎসরূপী শিব ; তিনি নবরত্নভূষিতা; নারদাদিঋষিগণ শিবমোহিনী গুহ্যকালীর সেবা করেন; তিনি অট্টহাস্যকারিণী, মহাভীমা ও সাধকের অভিষ্ট ফলপ্রদায়িনী। গুহ্যকালী নিয়মিত শবমাংস ভক্ষণে অভ্যস্তা। মুর্শিদাবাদ-বীরভূম সীমান্তবর্তী আকালীপুর গ্রামে মহারাজা নন্দকুমার প্রতিষ্ঠিত গুহ্যকালীর মন্দিরের কথা জানা যায়। মহাকাল সংহিতা মতে, নববিধা কালীর মধ্যে গুহ্যকালীই সর্বপ্রধানা। তাঁর মন্ত্র বহু-প্রায় আঠারো প্রকারের

মহাকালী:

মহাকালীর রূপ নিয়ে দু'টি মত রয়েছে। তন্ত্রসার গ্রন্থমতে, মহাকালীর ৫ মুখ, ১৫ চোখ। তবে শ্রীশ্রীচণ্ডী মতে আদ্যাশক্তিকে ১০ মুখ, হাত, পা ও ৩০০ চোখের দেবী রূপে কল্পনা করা হয়েছে।তন্ত্রসার গ্রন্থমতে আরো বলছে, মহাকালী পঞ্চবক্ত্রা ও পঞ্চদশনয়না। তবে শ্রীশ্রীচণ্ডী-তে তাঁকে আদ্যাশক্তি, দশবক্ত্রা, দশভূজা, দশপাদা ও ত্রিংশল্লোচনা রূপে কল্পনা করা হয়েছে। তাঁর দশ হাতে রয়েছে যথাক্রমে খড়্গ, চক্র, গদা, ধনুক, বাণ, পরি, শূল, ভূসুণ্ডি, নরমুণ্ড ও শঙ্খ। ইনিও ভৈরবী; তবে গুহ্যকালীর সঙ্গে এঁর পার্থক্য রয়েছে। ইনি সাধনপর্বে ভক্তকে উৎকট ভীতি প্রদর্শন করলেও অন্তে তাঁকে রূপ , সৌভাগ্য, কান্তি ও শ্রী প্রদান করেন।

ভদ্রকালী:

ভদ্রকালী নামের ভদ্র শব্দের অর্থ কল্যাণ এবং কাল শব্দের অর্থ শেষ সময়। যিনি মরণকালে জীবের মঙ্গলবিধান করেন, তিনিই ভদ্রকালী। ভদ্রকালী নামটি অবশ্য শাস্ত্রে দুর্গা ও সরস্বতী দেবীর অপর নাম রূপেও ব্যবহৃত হয়েছে। কালিকাপুরাণ মতে, ভদ্রকালীর গাত্রবর্ণ অতসীপুষ্পের ন্যায়, মাথায় জটাজুট, ললাটে অর্ধচন্দ্র ও গলদেশে কণ্ঠহার।

তন্ত্রমতে অবশ্য তিনি মসীর ন্যায় কৃষ্ণবর্ণা, কোটরাক্ষী, সর্বদা ক্ষুধিতা, মুক্তকেশী; তিনি জগৎকে গ্রাস করছেন; তাঁর হাতে জ্বলন্ত অগ্নিশিখা ও পাশযুগ্ম। আবার রামপ্রসাদ তাঁর গানে উল্লেখ করেছেন,

"পাতালেতে ছিলে মাগো হয়ে ভদ্রকালী,
কত দেবতা করেছে পূজা দিয়ে নরবলি।"

গ্রামবাংলায় অনেক স্থলে ভদ্রকালীর বিগ্রহ নিষ্ঠাসহকারে পূজিত হয়। এই দেবীরও একাধিক মন্ত্র রয়েছে। তবে প্রসিদ্ধ চতুর্দশাক্ষর মন্ত্রটি হল-'হৌঁ কালি মহাকালী কিলি কিলি ফট স্বাহা।'

চামুণ্ডাকালী:

চামুণ্ডা কালী, দক্ষিণ কলকাতার আলিপুর-চেতলা অঞ্চলের আলিপুর সাধারণ সমিতির মণ্ডপে, ২০০৮।
চামুণ্ডাকালী বা চামুণ্ডা ভক্ত ও সাধকদের কাছে কালীর একটি প্রসিদ্ধ রূপ। দেবীভাগবত পুরাণ ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ-এর বর্ণনা অনুযায়ী, চামুণ্ডা চণ্ড ও মুণ্ড নামক দুই অসুর বধের নিমিত্ত দেবী দুর্গার ভ্রুকুটিকুটিল ললাট থেকে উৎপন্ন হন। তাঁর গাত্রবর্ণ নীল পদ্মের ন্যা য়, হস্তে অস্ত্র, দণ্ড ও চন্দ্রহাস; পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম; অস্তিচর্মসার শরীর ও বিকট দাঁত। দুর্গাপূজায় মহাষ্টমী ও মহানবমীর সন্ধিক্ষণে আয়োজিত সন্ধিপূজার সময় দেবী চামুণ্ডার পূজা হয়। পূজক অশুভ শত্রুবিনাশের জন্য শক্তি প্রার্থনা করে তাঁর পূজা করেন। অগ্নিপুরাণ-এ আট প্রকার চামুণ্ডার কথা বলা হয়েছে। তাঁর মন্ত্রও অনেক।

শ্মশানকালী:

কালীর "শ্মশানকালী" রূপটির পূজা সাধারণত শ্মশানঘাটে হয়ে থাকে। এই দেবীকে শ্মশানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনে করা হয়। তন্ত্রসাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ রচিত বৃহত্ তন্ত্রসার অনুসারে এই দেবীর ধ্যানসম্মত মূর্তিটি নিম্নরূপ:
শ্মশানকালী দেবীর গায়ের রং কাজলের মতো কালো। তিনি সর্বদা শ্মশানে বাস করেন। তাঁর চোখদুটি রক্তপিঙ্গল বর্ণের। চুলগুলি আলুলায়িত , দেহটি শুকনো ও ভয়ংকর, বাঁ-হাতে মদ ও মাংসে ভরা পানপাত্র, ডান হাতে সদ্য কাটা মানুষের মাথা। দেবী হাস্যমুখে আমমাংস খাচ্ছেন। তাঁর গায়ে নানারকম অলংকার থাকলেও, তিনি উলঙ্গ এবং মদ্যপান করে উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন।

শ্মশানকালীর আরেকটি রূপে তাঁর বাঁ-পাটি শিবের বুকে স্থাপিত এবং ডান হাতে ধরা খড়্গ। এই রূপটিও ভয়ংকর রূপ। তন্ত্রসাধকেরা মনে করেন, শ্মশানে শ্মশানকালীর পূজা করলে শীঘ্র সিদ্ধ হওয়া যায়। রামকৃষ্ণ পরমহংসের স্ত্রী সারদা দেবী দক্ষিণেশ্বরে শ্মশানকালীর পূজা করেছিলেন।

কাপালিকরা শবসাধনার সময় কালীর শ্মশানকালী রূপটির ধ্যান করতেন। সেকালের ডাকাতেরা ডাকাতি করতে যাবার আগে শ্মশানঘাটে নরবলি দিয়ে শ্মশানকালীর পূজা করতেন। পশ্চিমবঙ্গের অনেক প্রাচীন শ্মশানঘাটে এখনও শ্মশানকালীর পূজা হয়। তবে গৃহস্থবাড়িতে বা পাড়ায় সর্বজনীনভাবে শ্মশানকালীর পূজা হয় না। রামকৃষ্ণ পরমহংস বলেছিলেন, শ্মশানকালীর ছবিও গৃহস্থের বাড়িতে রাখা উচিত নয়।

শ্রীকালী গুণ ও কর্ম অনুসারে শ্রীকালী কালীর আরেক রূপ। অনেকের মতে এই রূপে তিনি দারুক নামক অসুর নাশ করেন। ইনি মহাদেবের শরীরে প্রবেশ করে তাঁর কণ্ঠের বিষে কৃষ্ণবর্ণা হয়েছেন। শিবের ন্যায় ইনিও ত্রিশূলধারিনী ও সর্পযুক্তা।

কালীপূজা:

গৃহে বা মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত কালীপ্রতিমার নিত্যপূজা হয়। এছাড়াও বিশেষ বিশেষ তিথিতেও কালীপূজার বিধান আছে। আশ্বিন মাসের অমাবস্যা তিথিতে দীপান্বিতা কালীপূজা, মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে রটন্তী কালীপূজা এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে ফলহারিনী কালীপূজা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও শনি ও মঙ্গলবারে, অন্যান্য অমাবস্যায় বা বিশেষ কোনো কামনাপূরণের উদ্দেশ্যেও কালীর পূজা করা হয়। দীপান্বিতা কালীপূজা বিশেষ জনপ্রিয়। এই উৎসব সাড়ম্বরে আলোকসজ্জা সহকারে পালিত হ য়। তবে এই পূজা প্রাচীন নয়। ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে কাশীনাথ রচিত শ্যামাসপর্যাবিধি গ্রন্থে এই পূজার সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। কথিত আছে, নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় অষ্টাদশ শতকে তাঁর সকল প্রজাকে শাস্তির ভীতিপ্রদর্শন করে কালীপূজা করতে বাধ্য করেন। সেই থেকে নদিয়ায় কালীপূজা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্র ঈশানচন্দ্রও বহু অর্থব্যয় করে কালীপূজার আয়োজন করতেন।

মহাকাল সংহিতা অনুসারে আবার কালী নববিধা। এই তালিকা থেকেই পাওয়া যায় কালকালী, কামকলাকালী, ধনদাকালী ও চণ্ডিকাকালীর নাম।

শেষ করি এক মহাত্মার কথা দিয়ে। জীবন্মুক্ত উচ্চকোটির মহাত্মা স্বামী পরমানন্দজীর কথায়, “কালী হচ্ছে Dynamic। প্রাণ, এখানে শিব Static, কালী Dynamic। প্রাণতত্ত্বই-কালীতত্ত্ব। শিবের বুকে কালী দাঁড়িয়ে আছে-কালী গতীয়মান আর শিব শান্ত-(Static) The Static itself is dynamic and dynamic itself is static Static এবং Dynamic হচ্ছে Mood(ভাব)।কমলাকান্ত তার গানে লিখেছেন,

“শ্যামা কখনও পুরুষ, কখনও প্রকৃতি,
কখনও শূন্যকার রে,
মায়ের এভাব ভাবিয়া,
কমলাকান্ত সহজে পাগল হোলরে।”

Quantum Mechanics বলছেন কমলাকান্ত। প্রকৃতিতে Absolute Static বলে তো কিছু নেই। Static & Dynamic Program Relativel Absolute is absolute that is existencial are as a Static or Dynamic depends on mood. Higher education-a Cosmology পড়ানো হচ্ছে, তাতে বলছে there is nothing but everything beyond time and dimension. এই conclusion-এ আসছে।

Absolute কি করে হবে তাহলে? সেটা বলতে গেলে বলতে হচ্ছে, Beyond time and dimension, Nameless, Formless,Baseless, Boundless।

কিন্তু কত আগে ঋষিরা বলেছিলেন-ভাবাতীতং, কালাতীতং, গগনসদৃশং, তত্ত্বমস্যাদিলকষ্য। আজকে বিজ্ঞানে আসছে এই কনসেপ্ট। That existence, beyond time and dimension. কিন্তু প্রশ্ন what is that? বলছে It should be Nameless. আবার প্রশ্ন- why? উত্তর- Because as it is beyond time & dimension it should be nameless or boundless। প্রশ্ন আসছে What is Static বা Dynamic?
Cosmology বলছে Fundamental (মৌলিক) কোন Static বা Dynamic নেই,সবই Conditional (আপেক্ষিক)। দেখুন সাধক কমলাকান্ত চেতনার ঐ স্তরে উঠে ঐ গানটা লিখলেন। তাহলে কমলাকান্তের শ্যামাতত্ত্ব বা শ্রীরামকৃষ্ণের কালীতত্ত্ব তো সেই ব্রহ্মই।
নরেন্দ্রনাথ একদিন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন–কালী কালী করেন, কালী কি?
ঠাকুর উত্তর দিলেন-
কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী নরেন, শুধু বোধ-বোধ। আধুনিক ভাষায়
Static itself is Dynamic, Dynamic itself is
Static, Narendranath, only that is realisation.

কিভাবে এটা Realise করবো?
উত্তর হবে-I can give you a conception, you have to perceive that through yourself and through realisation you will get that. I can not give you that. (নিজের মধ্যে তাকে জানতে হবে বোধ-বোধ করতে হবে। তাহলে তাকে পাবে, আমি তোমাকে তা দিতে পারি না)

কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী রামকৃষ্ণদেব বললেন। শাশ্বত কোন স্থিতিধর্ম বা গতিশীলতা নেই। একেই লীলা বলা হয়েছে, অর্থাত্ Play of consciousness, চৈতন্যের লীলা। ঠাকুর বললেন যেদিকে তাকাচ্ছি সেদিকেই দেখছি মায়ের লীলা, সবকিছুতেই মা ওতোপ্রোত হয়ে রয়েছেন। কথামৃতে রয়েছে ঠাকুর বলছেন সবই মায়ের লীলা, মায়ের খেলা, সবকিছুতেই মা ওতপ্রোত হয়ে রয়েছেন মা-ই সব কিছু করাচ্ছেন। তিনি একবার কলকাতার কোথায় যাচ্ছিলেন, সঙ্গে খাজাঞ্জি ছিল, পথে দেখলেন চার্চে খ্রীষ্টানদের প্রার্থনা হচ্ছে। উনি বললেন মা তোকে খ্রীষ্টানরা কেমন করে ডাকে দেখবো মা! সঙ্গে খাজাঞ্জি থাকায় ভেতরে ঢুকতে পারলেন না।

রামকৃষ্ণের বোধ–"মা বুদ্ধি" সর্বত্র। খ্রীষ্টানরা যাকে গড বলছে, রামকৃষ্ণ তাকেই মা বলছেন। রামকৃষ্ণ তত্ত্ব একটা সাংঘাতিক Synthesis-জান তো!

যুগপুরুষ বলা হচ্ছে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে, অর্থাৎ এ যুগে রামকৃষ্ণকে অতিক্রম করা যাবে না, রামকৃষ্ণকে মাধ্যম করেই এগিয়ে যেতে হবে আপনাকে। ঠাকুর ছিলেন যুগধর্ম প্রচারক,স্বামীজী সেটাই ছড়িয়ে ছিলেন সারাবিশ্বে। এক-একটা সময় আসে যখন যুগপুরুষ আসেন আর তখন তাকে অতিক্রম করা যায় না মাধ্যম করেই এগোতে হয়। যেমন সাকার-নিরাকার নিয়ে যে দ্বন্দ্ব, রূপ-অরূপ নিয়ে যে দ্বন্দ্ব, সব দ্বন্দ্বের অবসান হয়েছে - সবতত্ত্বই রামকৃষ্ণতত্ত্বে এসে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। সমস্ত রকমের মতবাদ, গোঁড়ামি, সমস্ত রকমের সংকীর্ণতা–সবকিছুই রামকৃষ্ণতত্ত্বে একাকার হয়ে যায়।

BANGLADARSHAN.COM

॥চৌষট্টি যোগিনী॥

তাঁদের বিবিধ রূপ ও ইতিহাস নিয়ে আলোচনা
****

প্রথম পর্ব:

অষ্টমাতৃকা ও ৬৪ যোগিনী:-

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

আমরা অষ্ট মাতৃকা এবং ৬৪টি যোগিনী সম্পর্কে হয়ত অনেকেই জানি, আমার আজকের আলোচনা কারা এই যোগিনী আমাদের হিন্দু তথা ভারতীয় পৌরাণিক শাস্ত্রে এদের সম্পর্কে কি বলা হয় এদের মন্দির নিয়ে।

যোগিনী হলো দেবীদুর্গার সহচরী, এঁদের নিয়ে দেবীদুর্গা উল্লাস হরষে সম্বিৎ পরশে রাস রঙ্গে" - করেন "রাস" তবে দশ মহাবিদ্যার মতো অষ্ট মাতৃকা হলো প্রধান আদি শক্তি মহামায়ার আংশ আর এই - " মাতি অয়ি দুর্গে অষ্ট মাতৃকার এক এক জনের আট জন সহচরী বা পরিচারিক‌া আছে যাদের একযোগে ৬৪টি যোগিনী বলা হয়। বিভিন্ন সময়ে যোগিনীরা দেবীকে সাহায্য করতে বা তাঁর উপদেশ অনুসারে কর্ম করতে আসতেন। দেবীদুর্গার পূজার সময় এই ৬৪ যোগিনীগণের পুজো করতে হয়। এঁরা হলেন মাতৃকা শক্তি, সৃষ্টিতে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত আছেন।

সাধারণত বিশ্বাস করা হয় আটটি যোগিনিদের অস্তিত্ব রয়েছে ভারতে,

যথামঙ্গলা : পিংলা, ধন্যা, ভ্রামরী, ভদ্রিকা, উলকা, সিদ্ধি, এবং সংকটা। এগুলি দেবত্ব গঠন হিসাবে বিবেচিত হয় আটটি দলের দ্বারা:

1. ব্রাহ্মী বা ব্রাহ্মণী দেবী যিনি প্রতিনিধিত্ব করেনবিশ্বমাতার।

2. বৈষ্ণবী দেবী মহাবিশ্বকে একটি সুনির্দিষ্টভাবে আকৃতি দিয়েছেন।

3. মহেশ্বরী দেবী তিনি সমস্ত সৃষ্টিকেই স্বতন্ত্রতা দেন।

4. কৌমারী দেবী আকাঙ্ক্ষার শক্তি প্রদান করেন।

5. বরাহী দেবী যিনি উপভোগ এবং আত্তীকরণের শক্তিস্বরূপা।

6. ঐন্দ্রি বা ইন্দ্রানী দেবী যিনি অপরিসীম শক্তির অধিশ্বরী যা মহাজাগতিক প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করেন। প্রকৃতির আইনের বিরোধিতা হলে তিনি ধ্বংস করে দেন।

7. চামুন্ডা দেবী আধ্যাত্মিক শক্তি জাগরণ করেন।

নবম থেকে তেরোশ শতাব্দীতে এই যোগিনীদের সক্রিয়তা বিশেষ ভাবে ছিল বলে মনে করা হয়। সেই অনুসারে বেশ কিছু যোগিনী মন্দির ভারতে আবিষ্কৃত হয়।

উড়িষ্যাতে দুটি, মধ্যপ্রদেশে তিনটি যোগিনী মন্দির রয়েছে। মনে করা হয় এই মন্দিরগুলি ছিল আসলে তন্ত্রবিদ্যা অনুশীলন কেন্দ্র।

১প্রথম মন্দিরটি অবস্থিত মধ্যপ্রদেশের মিটাবালি অথবা মিটাওলি গ্রামে। যা একান্তেশ্বরা মহাদেব মন্দির . নামেও পরিচিত। এই মন্দিরটির অনুকরণে ব্রিটিশ আর্কিটেক্ট স্যার অ্যাডমিন আমাদের ভারতে সংসদ ভবন অর্থাৎ পার্লামেন্টটি তৈরি করেন।

২ টি যোগিনী মন্দির যা সবচেয়ে প্রাচীন মন্দির বলে মনে করা৬৪ দ্বিতীয় মন্দিরটি হলো মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহ . হয়।

৩তৃতীয় মন্দিরটিও মধ্যপ্রদেশে.র জব্বলপুরে অবস্থিত যার অপর নাম শ্রীগৌরীশংকর মন্দির-, মনে করা হয় এই মন্দিরটি ১০০০শতাব্দীর আসেপাশে প্রতিষ্ঠিত হয়।-

৪চতুর্থ মন্দিরটি রয়েছে উড়িষ্যার হীরাপুরে .,এই মন্দিরের বিশেষত্ব হলো এটি সবথেকে ছোট ৬৪ যোগিনী মন্দির।

হীরাপুর ভুবনেশ্বরের ৬৪ যোগিনী মন্দির -

চৌষট্টি যোগিনী মন্দির (যোগিনী মন্দির ৬৪)হীরাপুর নামক একটি হাটবাজারে অবস্থিত-, যা পূর্ব ভারতের ওড়িশা রাজ্যের রাজধানী ভুবনেশ্বরের থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

চৌষট্টি যোগিনী মন্দির এর নির্মাণকাল অনুমানিক খ্রীষ্টিয় নবম শতকে। ব্রহ্ম রাজাদের শাসনকালে। রানী হীরা দেবী মন্দিরটি নির্মাণ করেন , তার নামেই গ্রামের নাম হীরাপুর। স্যান্ডস্টোনের তৈরী মন্দিরটি একটি বৃত্তের আকারে গঠিত। কেন্দ্রে অবস্থিত চণ্ডী মণ্ডপটি।বৃত্তাকার প্রাচীরের অভ্যন্তরে মূর্তিটি রয়েছে, প্রতিটি গৃহের মূর্তিটি একটি দেবী। দেওয়ালের গর্তে চারপাশে প্রায় ৫৬ টি মূর্তি রয়েছে, দেবীর মূল মূর্তিটির কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, মূর্তিটি দেবী কালীর, যিনি মানুষের মনকে হৃদয় জয় করার প্রতিনিধিত্বকারী মনুষ্য মাথার উপর দাঁড়িয়ে আছেন।

পাথরের দেয়ালে খোদাই করা ৫৬ টি কুলুঙ্গি তে বিভিন্ন রূপে বিরাজমান গ্রানাইট পাথরে তৈরী যোগিনী মূর্তিগুলি। প্রধানা মূর্তিটি কালী রূপে পূজিত হন। চন্ডী মণ্ডপ এর গায়ে আরো ৮টি যোগিনী মূর্তি।

মার্কন্ডেয় পুরাণে কথিত আছে রক্তবীজ দানবকে দমনকালে দেবী দূর্গা ৬৪টি রূপ নেন। রক্তবীজের রক্ত মাটি তে পড়ার আগেই যোগিনীরা তা পান করতে শুরু করেন। দানব দলন শেষে কথিত আছে যোগিনীরা মা দুর্গার সাথে পূজিত হওয়ার অনুরোধ রাখেন দেবীর কাছে।হাইপাইথাল স্থাপত্যের সাথে তান্ত্রিক প্রার্থনা রীতিনীতিগুলি ভৌমিকদের দ্বারা পূজা করে অগ্নি - টি উপাদান ৫ পরিবেশ যা প্রকৃতির), জল, পৃথিবী, আকাশ এবং ইথার (গঠিত। যোগিনী মূর্তি সাধারণত একটি পশু, একটি দৈত্য বা শক্তি বিজয়ী চিত্রিত একটি মানব (নারীর ক্ষমতার) মাথার উপর একটি মহিলা মূর্তি দাঁড়িয়ে প্রতিনিধিত্ব। প্রতিমাগুলি উন্মত্ততা, দুঃখ, আনন্দ, আনন্দ, বাসনা এবং সুখ থেকে সবকিছু প্রকাশ করে।

মন্দিরটি উচ্চতায় বড়জোর ২মিটার। প্রবেশদ্বার খুব ই নিচু। মাথা বাঁচিয়ে ঢুকতে হয়। গঠনশিল্প প্রধান ওড়িশী মন্দির গুলির থেকে একেবারেই অন্য রকম। এটি ছাদবিহীন)hypaethral) গঠন। প্রবেশ দ্বারের উল্টো দিকে একটি সূর্য চাতাল রয়েছে। চারিদিকে ধানক্ষেতের মধ্যে এই মন্দির প্রায় চোখেই পড়েনা। বর্তমানে archaeological survey of india এর তত্ত্বাবধানে রয়েছে।

ভুবনেশ্বর থেকে পুরী যাওয়ার রাস্তায় রাজরানী মন্দির এর পাশ দিয়ে যে রাস্তা গেছে সেটি ধরে বেশ কিছুটা এগোতে হয়। নদী পেরিয়ে ডান দিকের রাস্তা ধরে আরো খানিকটা। এখানে স্থানীয় লোকের সাহায্য নেওয়া ভালো। পথে রাজরানী ছাড়াও ব্রহ্মেশ্বর আর ভাস্করেশ্বর মন্দির পড়বে। মন্দিরে কোনো প্রবেশমূল্য নেই। তবে পূজারীর হাতে কিছু অর্থ দিলে তার অভিশম্পাত থেকে বেঁচে যাবেন।

৫পঞ্চম মন্দিরটি হলো উড়িষ্যার রানীপুরে অবস্থিত এই মন্দিরের উল্লের পাই ভারতীয় বহু পুরাণে ও পানীনির . বিখ্যাত গ্রন্থে। এই মন্দির পুরাণেতৃতীয় শতাব্দীর তে প্রতিষ্ঠিত সোমতীর্থ বলা হয়।

ভারতের কিংবদন্তি পুরাণ যেমনভগবত পূরাণ -ব্রহ্ম পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, বামনপুরাণ এবং কথাসরিৎসাগর গ্রন্থে এই আদি শক্তি সহচরী হিসাবে এদের আমরা পাই।

পূর্বে বলেছি যে অষ্টমাতৃকাদের সহচরী এই ৬৪টি যোগিনী,তাই আমি প্রথমে এই অষ্ট মাতৃকাদের নাম উল্লেখ করছি তাঁরা হলেন-

১ মধুমতী, ২ সুরসুন্দরী, ৩ মনোহরা, ৪ কণকবতী, ৫, কামেশ্বরী, ৬ রতীসুন্দরী, ৭ পদ্মিনী, ৮ নটিনী।

এই হলো প্রধান আট যোগিনী বা অষ্ট মাতৃকা। মনে করা হয় যারা এই ডাকিনী কিংবা যোগিনী বিদ্যায় সিদ্ধিলাভ করত, তারা অতিপ্রাকৃত শক্তির অধীশ্বরীতে পরিণত হতো।এরা নিজেদের শরীর ও মনের দ্বারা প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ

করতে পারত। যেমন নিজেদের ইচ্ছায় বৃষ্টিপাত ঘটানো, অসুস্থকে সুস্থ করে তোলা,কিংবা ধ্বংসাত্বক ক্ষমতার প্রয়োগে কোনো কিছুকে বিনাশ করা । এই যোগিনীরা বশীকরণ ও এমন নানা জাদুবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তাদের অপর এক বিশেষ ক্ষমতা হলো এরা আকাশে উড়ে বেড়াতে পারত,তাই মনে করা হয় প্রতিটি যোগিনী মন্দিরের ছাদ থাকে না তাদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য।

বলা হয় এই অষ্টমাতৃকা ও তাদের ৬৪ জন সহচরী সবাই আসলে পরম আদিদেবীশক্তির অংশ,এই যোগিনীগন আদিশক্তির জগৎ পরিচলনার কাজে সাহায্য করে। বলা হয় এই পৃথিবীর অন্তিমে এরা পুনরায় আদি শক্তির মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে।

বেশ কিছু শিলালিপি থেকে জানা যায় ১৬ই শতাব্দীতে আনুষ্ঠানিক ভাবে এই ডাকিনী বিদ্যা বা শক্তি সাধনা শেখান হতো কিন্তু পরবর্তী কালে ভারতীয় মূল ধর্ম থেকে এর কিছুটা বিচ্যুতি ঘটে।

কেউ কেউ মনে করেন এই বিশ্বাস এসেছিল আদিবাসী সম্প্রদায়ের মাধ্যমে। যারা মূলত গ্রাম্য দেবী বা প্রকৃতি দেবীর পূজারি ছিল। পরবর্তী কালে সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগে এই বিশ্বাসগুলি শাক্তবাদে (দেবীশক্তির অরাধনা) ও তন্ত্রবাদে পরিণত হয়।

৬৪ যোগিনী মন্দিরের বিভিন্ন জীবজন্তুর মতন মুখমন্ডল যুক্ত দেবী মূর্তিগুলি দেখে মনে হবে আরেকটি অতি-দেবীদের কথা । প্রচুর সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়-প্রাচীন সভ্যতায় পূজিত দেব, যোগিনী মূর্তিগুলির সঙ্গে প্রাচীন মিশরের পূজিত দেবদেবীদের। হিন্দুদের মতই প্রাচীন মিশরী-য়রা বহুত্ববাদী দেবতাদের উপাসক ছিলেন। আমরা যেমন গরু, ষাঁড়, বাঁদর, হনুমান, ভালুক, সাপ, বাঘ, সিংহ, পেঁচা সমস্থ প্রাণী জগতের মধ্যেই ভগবান আছেন - বলে বিশ্বাস করি, ঠিক সেরকম বিশ্বাস মিশরীয়দের মধ্যেও প্রচলিত ছিল।

মিশরের দেবদেবী-

তাই প্রাচীন মিশরে বৃষ রূপে “রে” বা “অসিরিস”, কুমিররূপী “সোবেক”, মেষ রূপী” আমন”, বাজপাখি রূপী “হোরাস”, গাভী রূপী “হাথর”, বানর রূপী “খৎ”, শিয়াল রূপী দেবতা “অনুবিস”, শকুন রূপী” নেকবেথ”, এরকম আরো কত যে দেবতা আছেন , তার হিসেব নেই। অর্থাৎ হিন্দুদের মতন আরেক সভ্য জাতি মিশরীয়রা সর্ব ভূতেই দেবদর্শন করতেন। প্রাচীন কালে প্রতিটি সভ্য জাতির ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম, কৃষ্টি ও সভ্যতার অসম্ভব মিল চোখে পরে।

বাংলায় তন্ত্র সাধনার ইতিহাসও কিন্তু অতি প্রাচীন। যোগিনী নিয়ে খনার বচন আছে-

“পু, ব, দ, ঈ, প, অ উনি
চারি চারি দণ্ডে ফিরে যোগিনী।

ঘোড়ার পৃষ্টে দেবী বায়
দক্ষিণে সম্মুখে ধীরে খায়।”

সারা বাঙলাতেই বিশেষ করে হুগলী, বীরভূম, পুরুলিয়া আর বাঁকুড়া জেলার এক বৃহৎ অংশে তান্ত্রিক ও নাথ যোগীদের দ্বারা একসময় তন্ত্র সাধনার চর্চা ছিল। সাধে কি আর, সাধক কমলাকান্ত অবধি গান রচনা করেন-

“ইড়া বামস্থানে পিঙ্গলা দক্ষিণে,
মধ্যে নাড়ী সুষুম্না॥
বামে ভাগীরথী মধ্যে সরস্বতী
দক্ষিণে যমুনা বয়।
মুলাধারে গিয়ে একত্র হইয়ে
ত্রিবেণী তাহারে কয়॥”

তবে বর্তমানেও উড়িষ্যায় বিস্ময়কর ভাবে এই জাদুবিদ্যার অনুশীলন চলে, যা ময়ূরভঞ্জ জেলার সাঁওতালদের মধ্যে বহুল প্রচলিত আজও। যেখানে মহিলারা গভীর রাত্রে স্বামীকে ঘুমন্ত অবস্থায় বিছানায় ফেলে রেখে সারা রাত জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় আর তার জঙ্গলে নৃত্য এ সঙ্গীতে মেতে ওঠে প্রফুল্লতার দেবতা 'বঙ্গাস'-এর সঙ্গে। এদের পোষ্য হয় বাঘ। এরা ভোররাত্রে বাড়ি ফিরে আসে। সাঁওতালরা মনে করে এই যোগিনীবিদ্যা কেউ জন্ম থেকে পায় না, কঠোর সাধনা দ্বারা অর্জন করতে হয়। এই যোগিনীকারা ৬৪ যোগিনীদের আওতা ভুক্ত নয়, এরা তন্ত্র সাধনা দ্বারা যোগবিদ্যা আয়ত্ত করে।

আমরা এবার হীরাপুরে অবস্থিত যোগিনী মন্দিরের নিরীক্ষে সেই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত কাত্যায়নী ও চৌষট্টি যোগিনীর বর্ণনা করব-

মন্দিরের বাইরের বৃত্তাকার দেওয়ারে খোদাই করা ৯ জন কাত্যায়নীর মূক্তি দেখতে পাই, যাদের এক যোগে নব কাত্যায়নী বলা হয়। এই প্রতিটি দেবীর মূর্তির উচ্চতা ২ ফিট ৬ ইঞ্চি থেকে ২ ফিট ১১ ইঞ্চি যা সুষ্ট পরিকল্পনা মাফিক ঘড়ির কাঁটার সজ্জা অনুসারে তৈরী করা হয়। এবং এক বিশেষ ধরনের হলদেটে বালি পাথর ব্যবহৃত হয়েছে এই মূর্তি গঠনে। প্রায় প্রত্যেক কাত্যায়নীই দুই বাজু বিশিষ্টা ও এঁরা সকলেই মানুষের একক ছিন্ন মস্তকের উপর অবস্থান করছেন।

১ম, কাত্যায়নীএই দেবী উদ্ধৃত ডান হাতে ধরে আছে তার অস্ত্র য -ো একটি তরোয়াল।সঙ্গে রয়েছে তাঁর দুই পুরুষ পরিচারক যারা রয়েছে ঢাক বাদ্যি নিয়ে।আর দেবী বিভিন্ন অলংকার যথা চুড়ি,গলাবন্ধনী দিয়ে সজ্জিতা।

২য়, কাত্যায়নীমুকুট -এই দেবী বিভিন্ন অলংকারে সজ্জিতা যেমন -, গলাবন্ধনী, আংটি ইত্যাদি। মাথার বাঁদিকে রয়েছে তার সুন্দর খোঁপা। তাঁর ডান পাশে অবস্থিত পুরুষ পরিচারক তার মাথায় ছত্র ধারণ করে আছে, আর তাঁর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে তার দুই সঙ্গী একটি সারমেয় ও একটি শৃগাল।

৩য়, এই দেবী এক হাতে নিয়েছেন অস্ত্র হিসাবে ছুরি ও অন্য হাতে নিয়েছেন নর খুলি। তাঁর নারী পরিচারিকা মাথায় ছাতা ধরে আছেন, আর দ্বিতীয় কাত্যায়নীর মতো এঁনারও সঙ্গী একটি সারমেয় ও একটি শৃগাল।

৪র্থ, এই দেবীরও মাথার ডান দিকে রয়েছে সজ্জিতা খোঁপা, বাজু পরে রয়েছেন রুদ্রাক্ষের বাজুবন্ধ। তাঁর ও পদতলে অবস্থান করছে একটি সারমেয় ও একটি শৃগাল,সেখানে তাঁর একজন নারী পরিচারিকা তাঁর সারমেয়কে খাদ্য দান করছে ও অন্য পরিচারিকা তাঁর মাথায় ছত্র ধারণ করে আছে।

৫ম, এই দেবী মূর্তি দৃশ্যতঃ দ্বিতীয় কাত্যায়নীর মতোই, এখানেও একজন নারী পরিচারিকা তাঁর মাথায় ছত্র ধারণ করে রয়েছে ও পদতলে একটি সারমেয় ও একটি শৃগাল।

৬ষ্ঠ, এই দেবী মূর্তির সাদৃশ্য লক্ষিত হয় চতুর্থ কাত্যায়নী দেবী মূর্তির সঙ্গে। তাঁর ডান পাশে রয়েছে একটি ছোট গাছ। ও এক নারী পরিচারিকা তাঁর মাথায় অর্ধ চন্দ্রাকৃতির ছত্র ধারণ করে আছে।

সপ্তম ও অষ্টম কাত্যায়নী তৃতীয় কাত্যায়নীরই ন্যায়।

৯ম, এই দেবী রুদ্ররূপী নগ্নিকা এক হাতে তাঁর তরোয়াল ও অন্য হাতে মানব খুলি দিয়ে তৈরি পাত্র ধারণ করে আছেন। এই মূর্তির সঙ্গে ধনুকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই দেবীর সঙ্গে তাঁর কোনো পরিচারিকা নেই। তবে তাঁর দুই সঙ্গী একটি সারমেয় ও একটি শৃগাল রয়েছে ও অন্যান্য প্রতিটি কাত্যায়নীর মতো তিনিও একক মানবের ছিন্ন মস্তকের উপর অবস্থান করছেন।

এবার আমরা আসি ৬৪টি যোগিনীদের বর্ণনায়___

১ এই দেবী চর্তুভুজা । তিনি অবস্থান করছেন এক পুরুষ মরদেহের উপর। তাঁর মাথায়- চণ্ডীকা/বহুরুপা/মায়া. রয়েছে এক বিশাল আকৃতির খোঁপা,তিনি ভিন্ন ভিন্ন অলংকার দ্বারা সজ্জিত যেমনবা -জুবন্ধ,গলাবন্ধ,কর্ন কুন্ডল ইত্যাদি। গলায় হার, কোমরে গোট, হাতে বাজুবন্ধ ও পায়ে নূপূর।প্রায় প্রত্যেক যোগিনীই এমন আলংকার দ্বারা সজ্জিত।

২এই দেবী দুই বাজু বিশিষ্টা । তিনি অবস্থান করছেন মৃত শরীরের উপর -তারা., তিনিও বিভিন্ন অলংকার দ্বারা সজ্জিতা। তাঁর মাথার বাম দিকে রয়েছে একটি সুন্দর খোঁপা।

৩এই দেবী ও দুই বাহু বিশিষ্টা -নর্মদা ., তার অবস্থান একটি হস্তির উপর। তিনি নানা রকম গহনার পাশাপাশি মুণ্ডমালা দিয়ে সজ্জিত, তিনি মানব খুলি দ্বারা নির্মিত নরকরোটির পেয়ালা পাত্র রক্তে পরিপূর্ণ(কাপালা) করে,পান করতে উদ্যত এমন ভাবে অবস্থান করছেন।তাঁর মাথার ডান দিকে রয়েছে তার সুন্দর খোঁপা।

৪এই দেবী চতুর্ভূজা তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন এক বৃহদাকার কচ্ছপ এর উপর । -যমুনা. চার হাত। ওপরের ডান হাতে কাপালা। বিরাট এক কচ্ছপের ওপরে দু মাথার ।(প্রত্যালিঢ় ভঙ্গী) পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে রয়েছে-ওপর কোঁকড়া চুল তার মাথা জুড়ে কেশ অবিন্যস্ত অবস্থায় রয়েছে। তিনি তার ডান হাতে একটি খুলির ।(জটামণ্ডল) পাত্র ধরন করে রয়েছেন।

৫ এই দেবী বা যোগিনী দুই বাজু বিশিষ্ট। তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন প্রস্ফুটিত পদ্মের - মানদা / কান্তি/লক্ষ্মী /শান্তি . উপর এবং প্রথম যোগিনী বহুরুপার মতনই তিনিও বহু অলংকার দ্বারা সজ্জিত। সঙ্গে তার বাহুবন্ধনী হিসাবে রয়েছে সর্প ও নাগের মাথাওলা বাজুবন্ধ (নাগকেযূর), পরনে ময়ূর পালকের ছোট ঘাগরা। প্রচলিত লক্ষ্মী মূর্তির সঙ্গে কোনও মিলই পাই না।

৬এই দেবী ও দুই - ক্রিয়া / বৃদ্ধি /ভারুনী/বারুনী. হাত বিশিষ্টা সমভঙ্গ মুদ্রায় দন্ডায়মান । তাঁর খোঁপা মাথার বাম দিকে অবস্থান করছে।এই মূর্তির মধ্যে অনেকগুলো জলতরঙ্গ খোদাই করা রয়েছে । তাঁর মস্তক অলংকার দ্বারা সজ্জিত।

৭এই দেবী চতুর্ভূজা তিনি কুমিরের উপর অবস্থান করছেন। তাঁর মাথায় - গৌরী/ অজিতা /ক্ষেমঙ্করী. রয়েছে সুসজ্জিত খোঁপা অঙ্গে গোট ।(চিগনোন), হার, বাজুবন্ধ, নূপূর ও মাথায় নানা অলংকার রয়েছে। । এই দেবীর অলংকার হলো মালা,গলাবন্ধনী, বাজু বন্ধন ইত্যাদি।

৮এই দেবী দু - ইন্দ্রানী / ঐন্দ্রি .'বাজু বিশিষ্টা।প্রত্যালিঢ় ভঙ্গীতে তিনি হস্তির উপর অধিষ্ঠিত ও তার মাথা জুড়ে রয়েছে একটি খোঁপা।

৯ইনি চতুর্ভূজা তার মুখমণ্ডল সেই বন্য শূকর এর আকৃতির। তাঁর অবস্থান একটি মেষের উপর -বরাহী ., তিনিও প্রথম যোগিনী বহুরূপার মতনই অলংকার দ্বারা সজ্জিত। তিনি মুকুট ও কিরীটা পরিহিতা ও তার এক হাতে মুণ্ড পাত্র ও অন্য হাতে ধনুক রয়েছে।

১০ রুদ্র মূর্তি ধারিণী এই যোগিনীর অবস্থান এক ফণা ধারী ভুজঙ্গের উপর।তাঁর মাথার - পদ্মাবতী /রণভীরা . উপরে খোঁপা অলকা দ্বারা সজ্জিত,ও বিভিন্ন অলংকারের সহ মুণ্ডমালা পরিহিতা।এছাড়া তাঁর ডান হস্তে রয়েছে খড়্গ।

১১ এই যোগিনী -মুখী-বানর/ অষ্টগ্রীবা / মারুতি .চতুর্ভূজা ও তাঁর নাম দ্বারাই পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে যে তিনি বানর মুখী। তাঁর অবস্থান এক দীর্ঘ প্যাঁচালো কণ্ঠ যুক্ত উটের পিঠে।

১২ দেবী দ্বৈত বাহু বিশিষ্টা সুতনুর অধিকারিনী। তার সমগ্র মস্তক জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে কোঁচকানো -বৈষ্ণবী . কেশ,তিনিও বিভিন্ন অলংকার দ্বারা সজ্জিত ও তিনি গরুড়ের উপর অবস্থান করছেন।

১৩ ত্রিভঙ্গ মুদ্রায় দন্ডায়মান অনিন্দ্যকান্তি ও হাস্যমুখী দেবী দুই বাহু বিশিষ্টা ও -কালরাত্রি/ পঞ্চবরাহী / বিরূপা . কমনীয় অঙ্গের অধিকারিনী। তাঁর মাথায় রয়েছে অতি সুন্দর একটি খোঁপা, তিনি ভাল্লুকের পিঠের ওপর অবস্থান করছেন।

১৪ এই দ্বিভঙ্গ মুদ্রার যোগিনীও দুই বাহু বিশিষ্ট। তিনি একটি ঢাকের উপর অবস্থান করছেন। তাঁর -বৈদ্যরূপা . মাথায় রয়েছে সজ্জিত খোঁপা।

১৫ ত্রিভঙ্গমুদ্রায় তিনিও দুই বাহু বিশিষ্ট এক পুরুষ দেহের উপর তার অবস্থান। কুঞ্চিতকেশ বিশিষ্ট -চর্চিকা . পুরুষটি একপ্রকার অর্ধ শয়নে রয়েছে, তার কোমরের কাছে রয়েছে একটি কাটারি ও ডান হাতে তিনি ধরে রয়েছেন একটি পদ্ম ফুল।তাকে অসুর বলে মনে করা হয়, যিনি এই যোগিনী দ্বারা পরাজয় প্রাপ্ত।

১৬- মার্জারি / বেতালি/বৈতালী . সমভঙ্গ মুদ্রায় এই যোগিনী চতুর্ভূজা । মৎস্য এর উপর তাঁর অবস্থান। তাঁর মাথায় একটি সুসজ্জিত খোঁপা রয়েছে ও তিনি অলংকার এর পাশাপাশি মুণ্ডমালা দ্বারা সজ্জিত।

১৭ দ্বিভঙ্গ মুদ্রায় তিনিও চতুর্ভূজা একটি মানব এর ছিন্ন মস্তকের উপর তাঁর অবস্থান। তার মাথায় -ছিন্নমস্তা . রয়েছে এক বিশাল খোঁপা, তাঁর বাম দিকের সর্বনিম্ন হাতে রয়েছে একটি ধনুক। এখানে চিরাচরিত ছিন্নমস্তা দেবী মূর্তির সঙ্গে পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। দেবী নিজে ছিন্নমস্তক নয়, বরং ছিন্নমস্তকের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে মূর্তিটি। এখানে নারীর অসহায়তার বদলে শক্তি প্রকাশ পাচ্ছে। প্রায় সবকটি দেবী মূর্তির ভাষ্যই যেন এই শক্তির প্রকাশ।

১৮এই দেবী দুই হাত বিশিষ্ট তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন একটি গুহার ছাদে - বিন্ধ্যবাসিনী / বৃষবাহনা .,যেখানে গুহার দ্বার দৃশ্যত। তার মুখমণ্ডলটি একটি মহিষের ।তিনি রুদ্র রূপিণী। তার মাথায় জুড়ে রয়েছে অবিন্যস্ত কেশ।

১৯ত্রিভঙ্গ মুদ্রায় ইনি দুই বাহু বি -জলকামিনী.শিষ্ট ও তার অবস্থান বৃহৎ আকৃতির ব্যাঙ এর উপর। তাঁর মাথার ডান দিকে রয়েছে একটি খোঁপা । তার পোশাক কোমর বন্ধনীর দ্বারা তিনি অতি সুসজ্জিত।

২০অনিন্দ্যকান্তি এই মূর্তিটি নৃত্যভঙ্গীতে দণ্ডায়মান। এই প্রসঙ্গে মনে করা যায় -ঘটবারা/ঘটভারা., ওড়িষার অন্য যে যোগিনী মন্দিরটি রানিপুর ঝরিয়ালে রয়েছে তার সবকটি মূর্তিই নৃত্যভঙ্গীমায় দণ্ডায়মান। শক্তিশালিনী এই- দেবী মূর্তিটি সিংহের ওপর দাঁড়িয়ে দুহাতে মাথার ওপর হাতি তুলেছে। হাতিটি মুখ লুকিয়ে রয়েছে।

২১অনিন্দ্যকান্তি দেবীর মাথার ডানপাশে চমৎকার কেশবন্ -কারাকালী/বিকারালি .ধ, সারমেয়র ওপরে দন্ডায়মান। ডান পা তুলে বাম পায়ের থাইয়ের ওপর দুই হাতে শক্ত করে ধরা দেখে মনে হয় যেন নূপূরটি ঠিক করে পড়ছেন। ভঙ্গীটি ভারী চমৎকার। যেন শ্রীরাধিকা, পাছে নূপূরের শব্দ শোনা যায় তাই কাপড়ে বেঁধে রাখছেন। সেই মুহূর্তটি যেন বাঁধা পড়েছে অনন্তকালের জন্য।

২২ দেবী চর্তুভুজা তিনি অবস্থান করছেন এক বৃহদাকার নাগের উপর।তিনি অন্যান্য যোগিনীদের -সরস্বতী . তুলনায় কিছুটা অদ্ভুত দর্শনা কারণ তাঁর একটি পুরুষালি গুম্ফ আছে। তাঁর হাস্তে রয়েছে বীনারই মতো এক বাদ্য তাঁর মাথায় উপরে রয়েছে একটি সুন্দ ।(তুমুরু)যন্ত্রর খোঁপা।

এইখানে এসে একটু থমকে যাই। মনে পড়ে যায় বিভূতিভূষণের বড় প্রিয় একটা গল্প –'মেঘমল্লার'। বিভূতিভূষণের নানা গল্পেই তন্ত্রের কথা বা অতীন্দ্রিয় শক্তির কথা ফিরে ফিরে এসেছে। এই গল্পে তান্ত্রিক গুণাঢ্য, প্রদ্যুম্ন নামে এক তরুণ শিল্পীকে ভুল বুঝিয়ে তার বাঁশির মেঘমল্লারের রাগে দেবী সরস্বতীকে বন্দী করে এই পৃথ্বীলোকে। দেবী আত্মবিস্মৃত হয়ে সাধারণ নারী হয়ে ওঠেন। গল্পের শেষে প্রদ্যুম্ন নিজে পাথর হয়ে গিয়েও দেবীকে তাঁর পূর্বরূপ ফিরিয়ে দেয়। প্রদ্যুম্নের প্রেমিকা সুনন্দাও কোনদিন জানতে পারেনি সে কথা। বহুদিন প্রদ্যুম্নের জন্য অপেক্ষা করে শেষে সন্ন্যাসিনী হয়ে গিয়ে সে মাঝে মাঝে স্বপ্নে জঙ্গলের মধ্যে এক পাথরের মূর্তিকে দেখতে পেত।

২৩ দ্বিভঙ্গপদ মুদ্রায় ঢেউয়ের ওপর দণ্ডায়মান এই যোগিনী দ্বৈত বাহু বিশিষ্ট ও তাঁর মাথায় উপরে -বিরূপা . রয়েছে একটি বৃহৎ খোঁপা। তাঁর মূর্তির পদতলে দুটি তরঙ্গ রেখা খোদাই করা রয়েছে আর তিনি তার উপরেই অবস্থান করছেন।

২৪ তিনিও দুই বাজু বিশিষ্টা তিনি অবস্থান করছেন পদ্ম ফুল দ্বারা সজ্জিত সাতটি রত্ন - শুভা/কাবেরী/কৌবেরী . কিরীটা ও রত্ন খচিত-ঘড়ার উপর।তাঁর মাথার রয়েছে সুসজ্জিত খোঁপা তিনি মুকুটমালা পরিহিতা।পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্মের ওপর নৃত্যভঙ্গীমায় দণ্ডায়মান দেবীর দুই হাত। পদ্মের ওপরে দেবীর পায়ের সামনে রাখা সাতটি রত্নকলস। মুকুট ও কিরীটিধারণ করা মস্তকের ডানপাশে চমৎকার কেশবন্ধন। অন্যান্য অলংকারের সঙ্গে কোমরে একটি রত্নখচিত গোট।

২৫দু -ভাল্লুকা .'হস্ত বিশিষ্টা তিনি ভাল্লুক মুখী তাঁর শরীরের সমস্ত অঙ্গ জুড়ে রোম রাশি লক্ষিত হয়।তিনি অবস্থান করছেন পদ্ম লতার উপর,তাঁর ডান হস্তে ডমরু এবং তিনি নানান অলংকারে সজ্জিতা।মাথার ওপর চুলের জটা। স্তম্ভমূলে পদ্মলতা।

২৬চর্তুভুজা এই যোগিনী রুদ - সিংহমুখী / নারসিংহী .ের রূপ ধারিণী এবং সিংহ মুখী।তাঁর মাথায় সিংহের কেশর উদ্ধৃত । তিনি তাঁর নিম্ন হস্তে একটি পাত্র ধারণ করে আছেন। তাঁর মূর্তির পদতলে পাঁচটি ফুল ও লতাপাতা লক্ষিত হয়।

২৭দ্বিভঙ্গ মুদ্রায় পদ্ম কুঁড়ি ও পাতার ওপর দণ্ডায়মান দুই বাজু বিশিষ্টা তিন -বীর্যা / বিরজা .ি কমনীয় শরীরের অধিকারিণী । তাঁর মাথার ডান দিকে রয়েছে সজ্জিতা খোঁপা। তাঁর মূর্তির পদতলে রয়েছে কুঁড়ি পাতা সহ পদ্ম ফুল আর তার উপরই দেবী অবস্থান করছেন।

২৮দুই বাহু বিশিষ্টা রুদ্র রূপিণী তিনি -বিকটাননা .,মাথার উপরের কুঞ্চিত কেশরাশি অবিন্যস্ত অবস্থায় রয়েছে৷ তাঁর ঠোঁট দুটি চঞ্চু আকৃতির আর তিনি রাগত ভয়ালদর্শনা। দুই হাত। উদ্গত ঠোঁট। মাথায় কোঁকড়া জটা চুলে সর্প মুকুট।

২৯দুই বাজু সহ তিনি সুতনু বিশিষ্টা । তিনি অবস্থান করছেন একটি ফুটন্ত পদ্মের উপর। তিনি সর্প - মহালক্ষ্মী . এছাড়া তাঁ ।মালা পরিহিতা ও বজ্র ধারিণীর দুই হাতে রয়েছে সুরক্ষা ঢাল।পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্মের ওপর দণ্ডায়মান লাবণ্যময়ী দেবীমূর্তির দুই হাত। গলায় সর্পের মালা। একহাতে বজ্র এবং অন্য হাতে ঢাল। মাথার ডানপাশে কেশবন্ধন।

৩০দু -কৌমারী .'বাজু ও কমনীয় তনুর অধিকারিণী । তাঁর অবস্থান একটি ময়ূরের উপর। তিনি ডান হস্তে রয়েছে রুদ্রাক্ষের মালা । তাঁর ঢাল সহ বাঁ হাতটি ভাঙা।দ্বিভঙ্গ মুদ্রায় ময়ূরের ওপর দণ্ডায়মান লাবণ্যময়ী দেবী মূর্তির দুই হাত। ডানহাতে অক্ষমালা। অন্যান্য যোগিনীদের মতো অঙ্গে হার, গোট, নূপূর নানান অলংকার। বাঁ হাতের ঢালটি ভেঙে গেছে। মাথার ডানপাশে কেশবন্ধ।

৩১অষ্টভুজা এই যোগিনী মূর্তি অন্যান্য সমস্ত যোগিনীদের থেকে ভিন্ন তার বৃহত্তর মূর্তির জন্য -মহামায়া .,তিনি অবস্থান করছেন একটি বৃহৎ পূর্ণ বিকশিত পদ্মের উপর, শক্তিপীঠের দেবীদের মতো তিনিও প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরে,কারণ তিনিই এই মন্দিরের মূল অধিষ্ঠাত্রী দেবী।স্থানীয় মানুষজনের কাছে এই মন্দির মহামায়া দেবীর মন্দির নামে পরিচিত। এছাড়া এই মন্দিরের দক্ষিণাভিমুখে একটি পুষ্করিণী রয়েছে যা মহামায়া পুষ্করিণী নামে বিখ্যাত। দেবী মুকুট কিরীটা বাজুবন্ধ ও নানা অলংকারে সজ্জিত।কালীকা পুরানের ৫৮তম অধ্যায়ে দেবী মহামায়া সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানতে পারি।পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্মের ওপর দণ্ডায়মান দেবীমূর্তিটি আকারে-আয়তনে অন্যান্য মূর্তিগুলির থেকে কিছুটা বড়। দশটি হাত চিরাচরিত দুর্গামূর্তির কথা মনে পড়ায়। মূর্তির পায়ের কাছে চৌকো আকারের শক্তিপীঠ । মাথায় মুকুট ও কিরীট। গলায়ে অপরূপ সুন্দর একটি হার। রত্নখচিত গোট, বাজুবন্ধ ও নূপূর। গ্রামদেবী হিসেবে এখনও পুজিত হন মহামায়া। তাঁর নামেই মন্দিরের স্থানীয় নাম মহামায়া মন্দির ও সংলগ্ন পুকুরটির নাম মহামায়া পুষ্করিণী। কালিকা পুরাণে যোগিনী মহামায়ার উল্লেখ আছে।

৩২দেবী দ্বৈত -উষা/রতি . বাহু বিশিষ্টা । রুদ্র ক্ষিপ্তবৎ মূর্তি ধারিণী। মাথার কুঞ্চিত কেশরাশি। তার দুই হস্তে রয়েছে তীর ও ধনুক।তিনি তাঁর স্কন্ধে বহন করছেন তূর্নী। তাঁর পদতলে ধনুর্ধারী মদনদেবের অবস্থান।প্রবল রাগান্বিত মুখমণ্ডল। মাথায় জটামণ্ডল। হাঁটু কিছুটা ভাঁজ করে দাঁড়ানো। স্তম্ভমূলে তীর ধনুক হাতে আর কাঁধে-তূণীর নিয়ে কামদেবের মূর্তি।

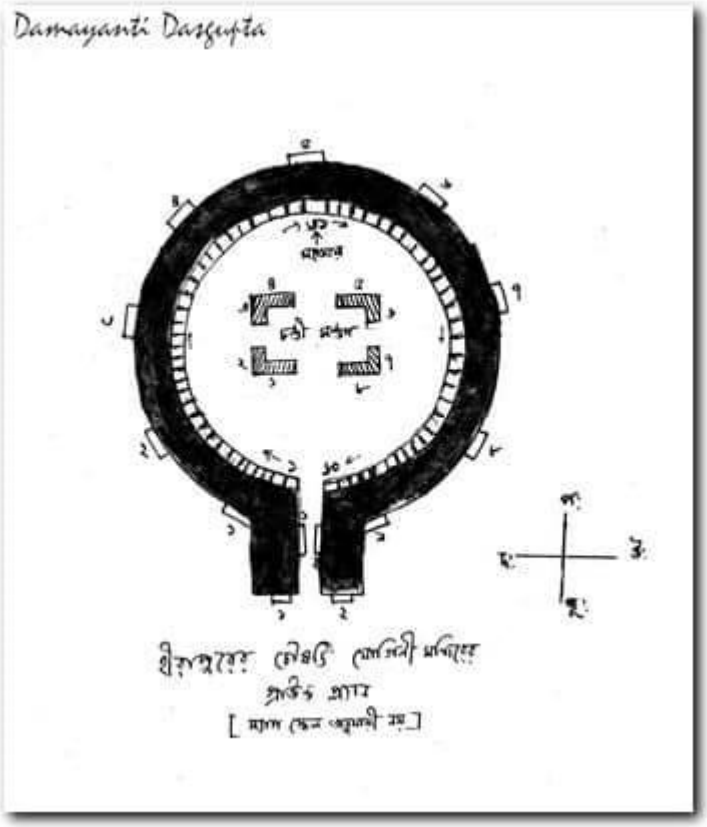

BANG .COM

যোগিনী নং ২০, ২১ ও ২২ - ঘটভারা, কাকারালি ও সরস্বতী

BANGLADARSHAN.COM

যোগিনী মহামায়া সহ অন্যান্যরা

BANGL N.COM

যোগিনী নং ১৩ - পঞ্চবরাহী

যোগিনী নং ৩ - নর্মদা

BANGLADARSHAN.COM

মহামায়া পুষ্করিণী

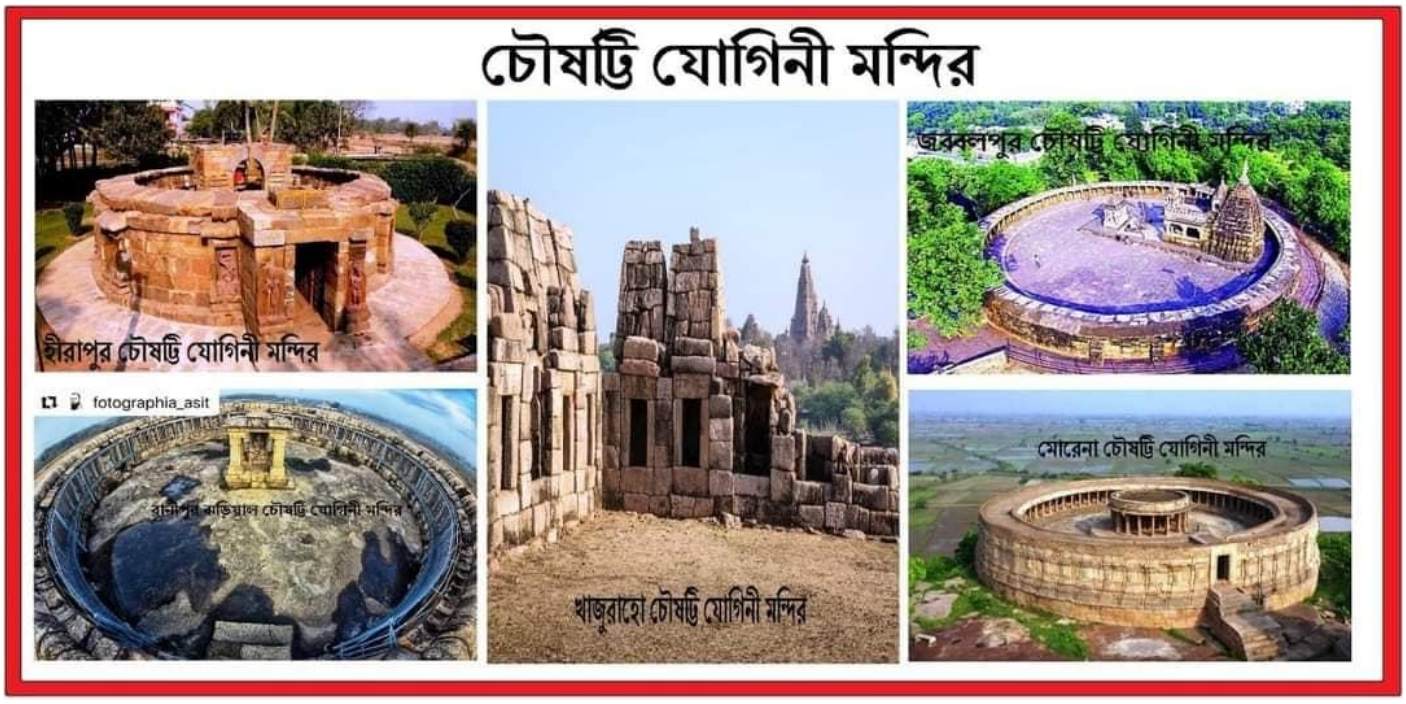

BANGLA AN.COM

BANGLADARSHAN.COM

BANGLADARSHAN.COM

॥দ্বিতীয় পর্ব॥

৩৩. কর্করী- ত্রিভঙ্গ মুদ্রায় কাঁকড়ার ওপর দাঁড়ানো অনিন্দ্যকান্তি দেবী মূর্তিটির দুই হাত। মাথার বামপাশে কেশবন্ধন। কানে, মাথায় নানা অলংকার, কোমরে গোট ও গলায় হার। কমনীয় গাত্র বিশিষ্টা। এই যোগিনী অবস্থান করছেন বৃহৎকার কাঁকড়ার উপর। মাথার বাঁ'দিকে খোঁপা লক্ষিত হয়। তিনি মালা কর্ণ কুণ্ডল সহ নানা গহনার দ্বারা সজ্জিত।

৩৪. সর্পসায়া/ সর্পশা / চিত্তলা-দেবী চার বাহু বিশিষ্টা ও সর্প মুখী, দ্বিভঙ্গ মুদ্রায় দন্ডায়মান এবং নানান অলংকারে সজ্জিতা। তার পদতলের অংশটি ভাঙা থাকায় জানা যায় না তিনি কার উপর অবস্থান করছেন।

৩৫. যক্ষীনী/ যোশা-ত্রিভঙ্গ মুদ্রায় চারপায়াওলা খাটের ওপর দাঁড়ানো দেবী মূর্তির দুই হাত। মাথার ওপর কিরীট আর জটামুকুট। বাজু বিশিষ্টা তিনি। তার অবস্থান চার পায়া বিশিষ্ট একটি টেবিলের উপর। তিনি কিরীটা ও মুকুট পরিহিতা।

৩৬. অঘোরা/ বৈবস্বতী-দ্বিভঙ্গ মুদ্রায় সিংওলা ছাগজাতীয় প্রাণীর ওপর দণ্ডায়মান দেবীর দুই হাত। ভয়ালদর্শনা দেবীর দুই চক্ষু কোটর থেকে প্রায় বেরিয়ে এসেছে। চুল মাথার ওপর ছড়ানো। দ্বিভুজা বিশিষ্টা এই যোগিনী রুদ্র রূপিণী। তিনি অবস্থান করছেন শৃঙ্গ বিশিষ্ট ছাগের উপর। তাঁর মাথায় একটি বিশালাকার উদ্ধত খোঁপা লক্ষিত হয়।

৩৭. রুদ্রকালী/ ভদ্রকালী (লঙ্কায়ং ভদ্রকালিকা)-সমভঙ্গ মুদ্রায় দণ্ডায়মান দেবীর দুই হাত। ডান হাতে একটি তরোয়াল। বাহন কাক। জটিল নক্সাকরা পোশাক ও অলংকার পরিহিতা। মাথার ওপরে খোঁপাটি অগ্নিশিখার ন্যায়।

৩৮. মাতঙ্গী/শীতলা/বিনায়কি/গণেশানি/গজাননা -দেবীর পেটমোটা হাতিমুখো চেহারা দেখলে গণেশের কথা মনে পড়বেই। তবে বাহন গাধা। দুই হাত আর মাথায় জটাজুট বা জটামুকুট।

৩৯. বিন্ধ্যবালিনী-প্রত্যালিঢ় মুদ্রায় ইঁদুরের ওপর দাঁড়িয়ে দুই হাতে ধনুক থেকে তির ছোঁড়ার টঙ্কার মুহূর্তটি যেন স্থির হয়ে রয়েছে। বাঁ হাতে ধনুকটি ধরা। ডান হাতে টান দিয়েছেন ছিলায়। মাথার ডানপাশে চমৎকার কেশবন্ধন।

৪০. অভয়া/বীরকুমারী-কাঁকড়াবিছের ওপর নৃত্যরত ভঙ্গীতে দাঁড়ানো দেবীমূর্তির চার হাতের ওপরের দুটি হাত নাচের ভঙ্গীতে উত্তোলিত। অপরূপ দেহভঙ্গিমা। মাথায় জটা মুকুট। তিনি নানান গহনার দ্বারা সজ্জিতা।

৪১. মাহেশ্বরী (মাহেশ্বরী সেতুবন্ধে)-দ্বিভঙ্গ মুদ্রায় ষাঁড়ের ওপর দাঁড়ানো দেবী চতুর্ভূজা। অঙ্গে নানা অলংকার। মাথার ডানপাশে কেশবন্ধন খোঁপা লক্ষিত হয়, অতি সুন্দর কোমর বন্ধন পরিহিতা।

৪২. অম্বিকা (অম্বিকা বরুণালয়ে)- চর্তুভুজা এই দেবীর অবস্থান একটি নকুলের বা বেজির ওপরে পৃষ্ঠে থাকা দুটি চাকার উপর। তাঁর নিম্নের দুটি হাত তার হাঁটু ছুঁয়ে আছে আর উপরের ডান হস্তে তিনি একটি ডমরু ধারণা করে আছেন।ভেঙে যাওয়া বাম হাতে সম্ভবত একটি পদ্ম।

৪৩. কামিনী/ কামায়নী - দ্বিভঙ্গ মুদ্রায় তিনি দুই বাজু বিশিষ্টা। একটি মোরগের উপর তাঁর অবস্থান। তিনি নানা অলংকারে সজ্জিতা ও তার মাথার ডানদিকে খোঁপা।
৪৪. ঘটবারি - দ্বিভঙ্গ মুদ্রায় দ্বৈত বাহু বিশিষ্টা। তাঁর অবস্থান একটি সিংহের পৃষ্ঠে। মাথায় তাঁর কুঞ্চিত কেশরাশি - করন্দ মুকুট এবং নানা অলংকারে সজ্জিতা।

৪৫. স্তুতি- সমভঙ্গ মুদ্রায় চর্তুভুজা একটি হলুদ কুটায় (হলুদ বাটা পূর্ণ পাত্রে) তাঁর অবস্থান। তাঁর মূর্তির পাশে একটি ফুলদানী রয়েছে। তাঁর মাথার ডান দিকে রয়েছে একটি খোঁপা যা ফুল দিয়ে সজ্জিত। এছাড়া তিনি নানা অলংকারে সজ্জিতা।

৪৬. কালী- দুই বাজু বিশিষ্টা । এই যোগিনী, এক অর্ধ শায়িত পুরুষের উপর দ্বিভঙ্গ মুদ্রায় দণ্ডায়মান। তিনি হস্তে ত্রিশূল ধারণ করে আছেন ও মাথার উপরে একটি সুন্দর খোঁপা লক্ষিত হয়।

নিম্নে শায়িত পুরুষটি মাথায় কিরীটা ও মুকুট পরিহিতা ও তাঁর তৃতীয় নেত্র রয়েছে যা দেখে আমরা অনুধাবন করতে পারি তিনি স্বয়ং মহাদেব শিব।

৪৭. উমা- এই যোগিনী চর্তুভুজা ও সুতনুর অধিকারিণী। মুকুট ও কিরীটা পরিহিতা। উপরের বাম হস্তে তিনি নাগপাশ অস্ত্র ধারণ করে আছেন আর তাঁর নিম্নের বাম হস্তটি রয়েছে অভয় মুদ্রায়। তাঁর পদতলে বহু পদ্ম ফুল প্রস্ফুটিত হয়ে আছে।

৪৮. নারায়ণী- দুই বাজু বিশিষ্টা। কমনীয় তনুর অধিকারিণী। তিনি বাম হস্তে সুরা পাত্র ধারণ করে আছেন ও ডান হস্তে তাঁর তরোয়াল। তাঁর দুই পায়ের মাঝে একটি মাটির তৈরি শঙ্কু ঢাকনা যুক্ত পাত্র রয়েছে। মাথায় টায়রা ও নানা অলংকার পরিহিতা।

৪৯. সমুদ্রা- দেবী দুই বাজু বিশিষ্ট । তিনি অবস্থান করছেন একটি শঙ্খের উপর। মাথায় বাম দিকে খোঁপা আর তিনি অলংকৃত।

৫০. ব্রাহ্মণী- এই যোগিনী চর্তুভুজা ও তিন মস্তক বিশিষ্টা। মাথায় কিরীটা ও মুকুট পরিহিতা, তিনি একটি পৈতা ধারণ করে আছেন। নানান গহনা পরে আছেন তাঁর মূর্তির পাশে সিংহের অবয়ব খোদাই করা এবং তাঁর অবস্থান পুস্তকের উপর।

৫১. জ্বালামুখী- দ্বিভঙ্গ মুদ্রায় দেবী দ্বৈত বাহু বিশিষ্টা ও তিনি অবস্থান করছেন একটি আট পায়া বিশিষ্ট চৌকির উপর। তিনি লম্ব কর্নের অধিকারিণী।

৫২. অগ্নি / আগ্নেয়ী - দুই বাজু বিশিষ্ট ও তিনি অবস্থান করছেন একটি ভেড়ার উপর। তাঁর ডান হস্তে তরোয়াল নানা অলংকার দ্বারা সজ্জিত ও তাঁর মূর্তির পিছনে একটি অগ্নিশিখা লক্ষিত হয়।

৫৩. অদিতি- সমভঙ্গ মুদ্রায় দ্বৈত বাহু বিশিষ্টা এবং তাঁর মাথার উপরে একটি খোঁপা লক্ষিত হয়। তিনি অবস্থান করছেন একটি টিয়াপাখির/ পায়রার উপর।

৫৪. চন্দ্রকান্তী- দ্বিভঙ্গ মুদ্রায় ইনিও দুই হস্ত বিশিষ্টা। তিনি অবস্থান করছেন একটি কাষ্ঠের তৈরি চার পায়া যুক্ত চৌকির উপর।তিনি নানান গহনা পরে আছেন ও মাথার ডান দিকে খোঁপা লক্ষিত হয়।

৫৫. বায়ুবেগা- দ্বিভঙ্গ মুদ্রায় দুই হাত বিশিষ্টা কমনীয়ত শরীরের অধিকারিণী। মাথার উপরে সজ্জিত খোঁপা লক্ষিত হয়। তাঁর অবস্থান একটি স্ত্রী চামরী গাইয়ের উপর।
৫৬. চামুণ্ডা-ত্রিভঙ্গ নৃত্যরত মুদ্রায় কস্তুরী মৃগের তিনি চর্তুভুজা এবং ভয়াল রূপিণী কঙ্কালসার দেহ ধারিণী এবং তাঁর স্তন দুটি অতি অনত। মাথার কেশরাশি অবিন্যস্ত অবস্থায় রয়েছে। তাঁর অবস্থান একটি কস্তুরী মৃগের উপর, উর্দ্ধের দুটি হস্তে তিনি একটি সিংহ ধারণ করে আছেন ও নিম্নের একটি হস্তে দা ও অন্য হস্তে ছিন্ন মস্তক ধারণ করে আছেন। তিনি মুণ্ডমালা পরিহিতা।

৫৭. মূর্তি/ মারুতি - ত্রিভঙ্গ মুদ্রায় এই যোগিনী দ্বৈত বাহু বিশিষ্ট ও তার অবস্থান একটি শৃঙ্গ বিশিষ্ট হরিণের উপর। তাঁর মাথায় একটি খোঁপা লক্ষিত হয়, চুল অগ্নিশিখার মত এবং তিনি নানান গহনা পরে আছেন।

৫৮. গঙ্গা- ত্রিভঙ্গ মুদ্রায় দেবী চর্তুভুজা একটি মকরের পৃষ্ঠদেশে তাঁর অবস্থান।উর্দ্ধের ডান হস্তে তিনি বৃন্ত যুক্ত পদ্ম ফুল ধারণ করে আছেন ও নিম্নের বাঁ হস্তে তাঁর নাগপাশ। তিনি নানা অলংকার দ্বারা সজ্জিতা।

৫৯. ধুমাবতী- সমভঙ্গ মুদ্রায় দ্বৈত বাহু বিশিষ্ট এই দেবীর অবস্থান একটি পার্বত্য রাজহংসের উপর। তাঁর দুই হস্তে রয়েছে শস্য ঝাড়াইয়ের যন্ত্র বা কুলো।

৬০. গান্ধারী - সমভঙ্গ মুদ্রায় অশ্বের ওপর দণ্ডায়মান দেবীর দুই হাত। মাথার বামপাশে কেশবন্ধন। দেবীর পশ্চাৎপটে একটি কদম্ববৃক্ষ।

মন্দিরের নীচের অংশের ৬০টি কুঠুরিতে ষাটটি যোগিনী মূর্তি রয়েছে। বাকি চারটি যোগিনী মূর্তি ও চারটি ভৈরব মূর্তির অবস্থান মন্দিরের কেন্দ্রে একটু উঁচুতে অবস্থিত গোলাকার চন্ডীমণ্ডপ বা যোগিনী মণ্ডপে।

৬১. সর্বমঙ্গলা- এই যোগিনীর কুলুঙ্গিটি শূন্য পড়ে আছে। পূর্বে এখানে মূর্তি থাকলেও বর্তমানে সেটি কোয়াখাইয়ের যমুনা কুণ্ডে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে এই মূর্তিটি সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না।

৬২. অজিতা- ত্রিভঙ্গ মুদ্রায় নৃত্যরত ভঙ্গিতে দেবী চর্তুভুজা, নক্সা যুক্ত সুন্দর পোশাকে তিনি অবস্থান করছেন পার্বত্য হরিণের পৃষ্ঠে। তাঁর মাথায় সুসজ্জিত খোঁপা লক্ষিত হয়।

৬৩. সূর্যপুত্রী- দেবী চর্তুভুজা সুতনু বিশিষ্টা কমনীয় ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান। তাঁর অবস্থান একটি ঘোড়ার পৃষ্ঠে, তিনি তূর্ণী ধনুক ও তীর ধারণ করে আছেন এবং তিনি মাথার কিরীটা ও দেহে নানান অলংকার দ্বারা সজ্জিত।

৬৪. বায়ুবীনা- নৃত্যরত ভঙ্গিতে এই যোগিনী দ্বৈত বাহু বিশিষ্টা ও নৃত্যরত অবস্থায় অবস্থান করছেন একটি কালো পুরুষ মৃগের উপর।তিনি কর্ণ কুণ্ডল(কাপা/খাপা)সহ নানা রকম অলংকারে সজ্জিতা।তাঁর মূর্তির পাশে দুটি ফুলদানী লক্ষিত হয়।

প্রথম ভৈরব-
এই মন্দিরের দক্ষিণ-পূর্বে প্রথম ভৈরব বিরাজমান। যাকে 'এক পাদ ভৈরব বা অজৈকপাদ ভৈরব' বলা হয়। তিনি মূলত এক পা ও উর্দ্ধ লিঙ্গ বিশিষ্ট। তাঁর অবস্থান একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম ফুলের উপর। তিনি মাথায় কিরীটা ও মুণ্ডমালা পরিহিতা, তিনি সর্প বলয় (সর্প করভূষণ) ও সর্প কৌরা (সর্প নূপুর) পরিহিত। তিনি ধারণ করে আছেন খড়্গ, সুরক্ষা ঢাল সহ মাছের পৃষ্ঠবংশ। তাঁর মাথার চারপাশে জ্যোতিবলয় লক্ষিত হয়, তাঁর দুই সঙ্গী তরোয়াল আর সুরক্ষা ঢাল সহ অবস্থান করছেন।

দ্বিতীয় ভৈরব-
তিনি দশভুজা ও পদ্মাসনে প্রস্ফুটিত পদ্ম ফুলের উপর তার অবস্থান। তিনি রুদ্র রূপ ও উদ্ধত লিঙ্গের অধিকারি। মাথায় কিরীটা পরিহিত ও জ্যোতিবলয় লক্ষিত হয়। তিনি রুদ্রাক্ষ মালা, মুণ্ড পাত্র ও ডমরু ধারণ করে আছেন। তাঁর দুই মহিলা সঙ্গিনী রয়েছে একজন তার পদ্মাসনের নিম্ন অর্ধ শায়িত অবস্থায় রয়েছে অন্যজন তার মূর্তির পাশে দণ্ডায়মান তারা শঙ্খ ও মুণ্ড পাত্র ধরন করে আছে। দ্বিতীয় ভৈরবের দশটি হাত। বিশ্বপদ্মাসনে বসে রয়েছেন। উর্ধ্বলিঙ্গ। মাথায় কিরীট এবং অক্ষমালা, কাপালা ও ড্রাম হাতে। মাথার আলোক বলয়ের ওপরে দুই উড়ন্ত নারী মূর্তি। স্তম্ভমূলে নারী দেহরক্ষীদের হাতে শাঁখ এবং কাপালা।

তৃতীয় ভৈরব
তৃতীয় ভৈরবও প্রায় দ্বিতীয় ভৈরবের ন্যায়। পার্থক্য হল, এর অঙ্গে নানাবিধ অলংকার। হাতে অক্ষমালা ছাড়াও ঢাল, ডমরু ও ত্রিশূল। স্তম্ভমূলে থাকা নারী দেহরক্ষীদের ভয়াবহ মুখশ্রী, হাতে শুধুমাত্র কাপালা।

চতুর্থ ভৈরব
চতুর্থ ভৈরবও প্রায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভৈরবের মতোই। পার্থক্য হল, এর হাতে শুধুই ডমরু ও অক্ষমালা। স্তম্ভমূলে একটি পুরুষ ও একটি নারী দেহরক্ষী। নারী দেহরক্ষীর হাতে তরোয়াল ও কাপালা। পুরুষ দেহরক্ষীটি শুয়ে রয়েছে যার করতলের ওপর ভৈরবের ডান পা রাখা রয়েছে।

মন্দিরের বাইরে দরজার দুপাশে দুই দ্বারপাল তো আছেই। ঢোকার গলির দুপাশেও দুটি পুরুষ মূর্তি রয়েছে। আর মন্দিরের বাইরের গায়ে রয়েছে নয় কাত্যায়ণী। এই পরিচারিকারাও মন্দির রক্ষা করছে। বাইরেটা দেখে নিয়ে ভেতরে ঢোকা উচিৎ।

ঢোকার সময়ে ডান হাতের মূর্তিটি কালভৈরবের। আর অন্যটি বৈকাল ভৈরব। দুজনেরই কঙ্কালসার চেহারা, মাথায় জট পাকানো চুল আর লড়াকু ভঙ্গী। কাল ভৈরবের ডান হাতে একটি কাপালা আর বৈকাল ভৈরবের বাম হাতে একটি নরমুণ্ড। কাল ভৈরবের মূর্তির স্তম্ভমূলে একটি ফুলগাছ, একটি শেয়াল আর কাটারি ও কাপালা হাতে দুজন পরিচারক। বৈকাল ভৈরবের পরিচারক দুজনের মধ্যে একজন রক্তপানে ব্যস্ত আর আরেকজনের দুহাতে দুটি কাপালা।

এই হীরাপুরের মন্দিরটি বালি পাথর ও মোরাম দিয়ে গাঁথা। যোগিনী মূর্তি গুলি তারী হয়েছে নরম গ্রানাইট ও ধূসর বর্ণের ক্লোরাইট দিয়ে। প্রতিটির যোগিনী জন্য মন্দিরের অন্তঃপুরে আলাদা আলাদা কুলুঙ্গী রয়েছে। বেশ কিছু বছর আগে মধ্য স্থলে অবস্থিত চন্ডী মন্ডপটি নতুন করে তৈরি হয়। সেখানে আবার আটটি কুলুঙ্গী তৈরি হয়

তার মধ্যে চারটি ভৈরবের জন্য আর চারটি যোগিনীর জন্য। শুধু মাত্র ৬১নং যোগিনী সহ মূল মন্দিরের প্রতিষ্ঠিত মহাদেব মহাভৈরবের মূর্তি বর্তমানে আর নেই। প্রতিটি যোগিনী মূর্তির উচ্চতা ২'ফুট ও তাদের ক্লোরাইটের ফলক গুলি অতি নিখুঁত ভাবে মিনিয়েচার নক্সা দ্বারা খোদাই করে প্রস্তুত করা হয়েছে, এই ধরনের ভাস্কর্য উড়িষ্যার বিভিন্ন মন্দিরেও লক্ষিত হয়। কিন্তু এই মন্দিরের যোগিনী মূর্তিগুলি গড়ার জন্য অন্য মাত্রা পেয়েছে।
মন্দিরে ঢোকার দরজার দুপাশে দুই পুরুষ দ্বারপাল। দুজনেরই দুই হাত এবং স্তম্ভমূলে পদ্মলতা। দক্ষিণের দ্বারপালের কানে অলংকার। উত্তরের দ্বারপালের একটু মোটাসোটা রাগী চেহারা। বাঁ হাতে একটি কাপালা।
নব কাত্যায়নী মূর্তিগুলি হালকা হলুদ রঙের বালিপাথরে মূর্তিগুলি আড়াই থেকে প্রায় তিন ফুট পর্যন্ত লম্বায়। অধিকাংশেরই দুই হাত আর দাঁড়িয়ে রয়েছে ছিন্ন নরমুণ্ডের ওপরে।
প্রথম কাত্যায়ণীর ডান হাতের তলোয়ার উঠেছে মাথার ওপরে। হাতে সোনার চুড়ি, গলায় হার। স্তম্ভমূলে দুই পরিচারক ড্রাম বাজাচ্ছে।

দ্বিতীয় কাত্যায়ণীর অঙ্গে বাজুবন্ধ, হার ও নূপূর। মাথার বাঁপাশে খোঁপা। ডানদিকে এক পরিচারক মাথায় ছাতা ধরেছে। স্তম্ভমূলে একটি শেয়াল ও একটি কুকুর।

তৃতীয় কাত্যায়ণীর ডান হাতে কাটারি, বাম হাতে কাপালা। ডানদিকে এক পরিচারিকা মাথায় ছাতা ধরেছে। স্তম্ভমূল দ্বিতীয় কাত্যায়ণীর অনুরূপ।

চতুর্থ কাত্যায়ণী প্রায় তৃতীয় কাত্যায়ণীর মতোই। পার্থক্য হল, এর মাথার ডানপাশে খোঁপা, হাতে অক্ষমালা। স্তম্ভমূলে এক পরিচারিকা কুকুরটিকে খাওয়াচ্ছে।

পঞ্চম কাত্যায়ণী প্রায় দ্বিতীয় কাত্যায়ণীর ন্যায়। এখানে শুধু পরিচারকের বদলে পরিচারিকা মাথায় ছাতা ধরেছে তৃতীয় ও চতুর্থের মতো।

ষষ্ঠ কাত্যায়ণী অনেকটাই চতুর্থ কাত্যায়ণীর মতোই। পার্থক্য বলতে এর ডানদিকে একটি গাছ রয়েছে আর পরিচারিকাটি ছাতার বদলে মাথার ওপর চাঁদের কলা ধরেছে।

কাত্যায়ণী সাত ও আট উভয়েই হুবহু কাত্যায়ণী তিনের মতো।

নবম কাত্যায়ণী বাকি আটজনের থেকে কিছুটা ছোট আকারের। অনেকটা প্রথম কাত্যায়ণীর মতোই। পার্থক্য হল নবম কাত্যায়ণী নগ্ন, রাগত লোচনা, হাতে একটি ধনুকও রয়েছে। পরিচারক বা পরিচারিকা নেই। আর স্তম্ভমূলে দুইটি শিয়াল।

BANGLADARSHAN.COM

BANGLADARSHAN.COM

॥তৃতীয় পর্ব॥

অনুভবের থেকে:

****

ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা যা দ্রাবিড় সভ্যতা নামে পরিচিত তাতে নারীকে সম্মান করার একটা প্রথা ছিল। পরবর্তীকালে বিদেশি অনুপ্রবেশ যত ঘটেছে ততো নারীর অবমূল্যায়ণ ঘটেছে সমাজে। এখনও দুর্গা বা কালী মূর্তির মধ্যে শক্তিময়ীরূপে নারীকে পুজো করার রীতি রয়েছে কিন্তু বাস্তবে তাকে অনেকটাই শক্তিহীনা বলেই বিবেচনা করে নেওয়া হয়। যেন আর্থিক স্বাধীনতা আর পোশাকের হ্রষতাই নারী মুক্তির একমাত্র উপায়। অথচ মাত্র পঞ্চাশ-একশো বছর আগেও যে নারীরা লাঠি ছোরা খেলায় ওস্তাদ ছিলেন, অনায়াসে হারিয়ে দিতেন ডাকাতদলকে পেশীশক্তিতে অথবা বুদ্ধিমত্তায় অথবা বিদেশি শাসক কী স্বাধীন দেশের সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে উঠতেন তাঁদের অধিকাংশই সেই অর্থে অর্থনৈতিক স্বাধীন ছিলেননা এবং পোশাক নিয়ে বা নিজেকে অন্যের চোখে সুন্দর প্রতিপন্ন করার জন্য সচেতন ছিলেন না। বরং একশো-দেড়শো বছর আগে যখন শাড়ির সঙ্গে ব্লাউজ বা অন্তর্বাস ব্যবহার করার চল ছিল না অথবা নামের পাশে পদবী ব্যবহার করার অনুমোদন ছিল না, সেই নিয়ে তাঁরা লড়েছেন সমাজ-সংস্কারের বিরুদ্ধে। শক্তিময়ী, বুদ্ধিমতী এইসব নারীরাই চিরকালের আধুনিকা। যোগিনী পুজো কেন ভারতবর্ষে বারবার করে আড়ালে চলে গেছে বা একটা রহস্যময় ভয়ের সৃষ্টি করেছে তার মূলেও রয়েছে হয়ত নারীর প্রতি অবমাননার প্রকট অথবা প্রচ্ছন্ন ধারণা। ডাকিনী-যোগিনী নিয়ে প্রচলিত গল্পে বা প্রথায় তাদের সুন্দরী, যৌনতার প্রতিচ্ছবি এবং হিংস্র মানসিকতার দেখানো হয়। অথচ যোগিনী মূর্তিগুলি অপূর্ব লাবণ্যময়ী আকর্ষণীয় দেহ বা কখনও ভয়ানক চেহারা নিয়েও কিন্তু লাস্যময়ী-যৌনতা, ভীতি অথবা বীভৎসতার প্রতীক নয়। এভাবে সমাজ তাকে উপস্থাপিত করেছে। যাতে ভারতবর্ষের নারীর শক্তিময়ী সত্যিকারের রূপটি প্রতিষ্ঠিত না হয়।

কিন্তু আসলে মূল ভাবনা কি এই কল্পনা নির্মাণের সময় সত্যিই তাই ছিল নাকি শক্তিময়ী নারীকে, যে নারী জন্ম দেয়, পালন করে, রক্ষা করে তাকে সম্মান করেই করা হয়েছিল? আবার এও মনে হয়েছে, যেন কত যুগ আগের পুরুষ শাসিত সমাজের অভিশাপে শক্তিময়ী নারী ক্ষুদ্রাকার মূর্তিরূপে বাঁধা পড়েছিল কালো পাথর-মাটির আবরণে। একেকটা ভঙ্গী যেন এক একটা মুহূর্ত রচনা করেছে। যে মুহূর্তে তাদেরকে যেন বলা হয়েছিল, স্ট্যাচু। তারপর কেটে গেছে অনন্তকাল। এই অনন্তকাল ধরেই তারা অপেক্ষা করে আছে প্রদ্যুম্নের মতো প্রকৃত মানুষের, যার বাঁশির সুর তাদের বাঁধবে না। মুক্তি দেবে চিরকালের মতো।

ঐতিহাসিক বা গবেষক কোনটাই নই, পড়াশোনাও খুব সামান্যই। অনুভূতি থেকে যা সত্য বলে উপলব্ধ হয় তাই লিখি, লিখে যাই। ব্রাহ্মণী মূর্তিতে গলায় পৈতের উপস্থিতি ধর্মে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের প্রকাশ করছে। এর বহু বছর পর লালন গেয়েছিলেন, ‘বামুন চিনি পৈতে প্রমাণ, বামনি চিনি কী প্রকারে?’ অর্থাৎ মধ্যযুগে এসে ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও মেয়েদের পৈতে পরার অনুমোদন শাস্ত্রে বা সমাজে আর ছিল না। শুধু নারীই বা বলি কেন? যোগিনী সরস্বতীর মূর্তিটি দেখলে ট্রান্সজেন্ডার বা হিজড়েদের কথা মনে আসে। এখানে বাইরে থেকে দেখে নারী শরীরে যে পুরুষালি ভাব প্রকাশ পাচ্ছে তার জন্য দেবীর মধ্যে কোনও সংকোচ নয়; শক্তিময়ীর একটা অহংকার

ফুটে উঠছে গোঁফ চুমড়ানোর মধ্যে। আবার কোনও কোনও যোগিনীর মুখমণ্ডল পশুর ন্যায় বা বিভিন্ন মূর্তির সঙ্গেই পশুর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এক্ষেত্রেও মনে হয়েছে 'পশু' শব্দটা যে অনুভূতিতে আমরা চট করে ব্যবহার করে ফেলি এখানে তা করা হয়নি। নারীর মতোই পশুর স্থানও সম্মানীয়। প্রাচীন অনেক সভ্যতাতেই কোনও কোনও পশুকে দেবতাজ্ঞানে পুজো করা হত। আরও একটা প্রশ্ন জাগে মনে। মোট ছটি প্রধান পুরুষ মূর্তি বা ভৈরবের মধ্যে মন্দিরের অভ্যন্তরের চারটি ভৈরবের মূর্তিরই উর্ধ্বলিঙ্গ কেন? এখানে কি নারী নয়, পুরুষকেই যৌনতার চিহ্ন বলে মনে করা হয়েছে?

মহামহিমাশালিনী মহত্তমা মহাজননী মহামায়ার মহাপুজায় সমগ্র বাঙালি জাতি ব্রতী। দিব্যদীপ্তিমালিনী দনুজদলনী ভদ্রা ভগবতী শ্রীশ্রীদুর্গাদেবী আসন জুড়ে বসে আছেন মণ্ডপ আলো করে। মাতৃমূর্তি যেন সংহতিরই বিজয়োৎসব।

এই বেদবন্দিতা বিশ্বপালিনী পরব্রহ্ম পরমাশক্তি নামভেদে ও রূপভেদে বহু পরিচয়ে পরিচিত হয়ে ভক্তজনের অনুগ্রহ করার নিমিত্ত প্রকাশিত হন। দেবী ভাগবতে ব্যাসদেব রাজা জন্মেজয়কে মহামায়ার স্বরূপ বিবৃত করতে গিয়ে বলেছেন,-"একই নট যেমন লোকরঞ্জন নিমিত্ত বেশ পরিবর্তন করে রঙ্গমঞ্চে বিভিন্ন ভূমিকা অভিনয় করে থাকে, সেইরূপ এই অদ্বিতীয়া ভগবতী চণ্ডিকা দেবতাদের কার্য সম্পাদনের জন্য স্বলীলায় বহুমূর্তি ধারণ করেন।" দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গার বহুবিধ ও বিচিত্র বরণা দিব্যমূর্তির মধ্যে দশমহাবিদ্যা রূপে দশবিধ মূর্তিতে যে আত্মপ্রকাশ তা বিভিন্ন শাক্ত শাস্ত্রে দৃপ্ত কণ্ঠে বিঘোষিত। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে জগন্মাতা নানাভাবে নানারূপে সাধকের উপলব্ধিতে বিভাসিতা। অর্গলা স্তোত্রে মহাশক্তির দশটি রূপের আরাধনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এইসব দেবী মূর্তি দশরূপে দশদিকে ব্যাপ্ত হয়ে চতুবর্গ ফল প্রদান করেন। দেবীর দিবা শক্তির স্বরূপ আভাষিত দেবী কবচের শ্লোকে মহাবিদ্যার এই নয়টি রূপ সমষ্টিগতভাবে নবদুর্গা নামে বিশেষ প্রসিদ্ধ। চণ্ডীর অষ্টম অধ্যায়ে ব্রহ্মাণ্যাদি অষ্টশক্তির কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। দুর্গাপূজার মহাষ্টমী তিথিতে এইসব দেবীর আহবান করে যথাবিহিত উপাচার প্রদানের পর চতুঃষষ্ঠী যোগিনীর পূজা করতে হয়।

কখনও কখনও দুর্গার সঙ্গিনী এবং তাঁর শরীর থেকেই সৃষ্টি হওয়া মাতৃকাদের যোগিনী বলে গণ্য করা হয়। রক্ত বীজ যুদ্ধ কালীন ভগবতী চণ্ডিকা নিঃশাস ত্যাগ করেন তা থেকে দেবী সৈন্যের জন্ম হয় ,এদের যোগিনী বলা হয়। সাথে এটাও বলা হয়, মায়ের সাহায্যে করতে অষ্ট শক্তি আসেন , তাদের প্রত্যেকের সঙ্গের ৮ জন দেবী সৈন্য আসে তাদের সাহায্য করতে (অষ্ট শক্তি হতেই দেবী সৈন্যের জন্ম), মোট ৮*৮=৬৪

যোগিনী হল পুরুষবাচক সংস্কৃত শব্দ যোগীর নারীবাচক শব্দ, যেখানে "যোগিন" শব্দটি পুরুষ, নারী বা লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ভাবে ব্যবহৃত হয়। যোগীর সমস্ত কিছুর একটি লিঙ্গ-তকমা ছাড়াও, যোগিনী যুগপৎভাবে যোগের একজন মহিলা অভিজ্ঞ অনুশীলনকারী এবং ভারত, নেপাল ও তিব্বতে মহিলা হিন্দু বা বৌদ্ধ আধ্যাত্মিক শিক্ষকদের জন্য সম্মানের একটি প্রাতিষ্ঠানিক শব্দ উভয়েরই প্রতিনিধিত্ব করে।

দেহের এক একটি ক্রিয়া এক প্রকটি শক্তিপ্রভাবেই হয়ে থাকে। চর্চা করলে সে সকল শক্তিকে প্রবল করা চলে। যে শক্তির প্রভাবে ভুক্ত অল্প হতে দুগ্ধের উৎপত্তি হয়, এবং মূত্র পুরীষ পৃথক হয়ে যায় এবং এই দুগ্ধ বা পীযুষ হতে শুক্র ও বেদ মজা নির্মিত হয়, তাই হংসঃশক্তি। দেহের মধ্যে এ বস্তুপ্রকারের চতুঃষষ্টি শক্তি আছে; এরাই চৌষটি যোগিনী। বাহিরো-বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এই চৌষট্টি যোগিনীর ক্রিয়া হচ্ছে , ভিতরে দেহভাণ্ডেও ঐ চৌষষ্টি

যোগিনীর ক্রিয়া সমভাবে হচ্ছে। বাহিরের ও ভিতরের শক্তির সামঞ্জসীকরণকেই-সমরস্য প্রাপ্তিকেই আগমনিগমানুসারে যোগ বলা হয়। তেমন পুরুষার্থ থাকে-নিজের দেহের সাহায্যে নিরালম্ব (ভাবে, নহিলে বাহিরের শক্তির সাহায্য নিয়ে স্বদেহস্থ সম্মুঢ় শক্তির উদ্বোধন সাধন করতে হবে। তন্ত্র, ভিতরের ও বাহিরের দুই পন্থাই স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন। এই নিগমাগমের, যোগসাধনার, আত্মদর্শনের থিওরি। গুরুমুখ না করে তন্ত্র বুঝা যায় না! এটি সাধনার ধন, Experimental Science, করে কম্মে করিয়া সম্মুখে দেখিয়ে দিতে হবে। গুরু দেখিয়ে দেন, শিষ্য সেই experiment দেখে নিদিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে ক্রিয়া করে থাকে। গুরুর সাহায্য ব্যতীত তন্ত্রসাধনা বুঝান যায় না। তাই তন্ত্রে গুরুর এতই আদর। কেবল তন্ত্র কেন, যোগ-শাস্ত্রেও-মাহেশ্বর যোগশাস্ত্র এবং পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র-সকল সাধন-শাস্ত্রেই গুরুর আসন অতি উচ্চে । গুরু ঈশ্বরের সমান পদবীর পুরুষ; কারণ, গুরুর সাহায্য ব্যতীত আত্মদর্শন সম্ভবপর নহে।

যোগিনী ভ্রমণ সম্বন্ধে খনার বচনে লিখিত আছে যে, “পু, ব, দ, ঈ, প, অ উনি। চারি চারি দণ্ডে ফিরে যোগিনী। ঘোড়ার পৃষ্ঠে দেবী ৱায়, দক্ষিণে সম্মুখে ধীরে খায়। (খনা)

জ্যোতিষে লিখিত আছে যে,– “প্রতিপন্নবমী পুর্ব্বে রামা রুদ্রাশ্চ পাবকে। শরত্রয়োদশী যাম্যে বেদা মালাশ্চ নৈখন্তে ॥ ষষ্ঠ চতুর্দশী পশ্চাৎ বায়ব্যাং মুনিপুর্ণিমে। দ্বিতীয় দশমী ধক্ষে ঐশান্তাং চাটমী কুছু। যোগিনী নবদ গুণন্তু শেষ বর্জ্যা: প্রষত্নতঃ। দক্ষণমূখযোগিন্তাং গমনং নৈব কারয়েৎ॥ বামে শুভকরী দেবী পৃষ্ঠে সর্ব্বার্থসাধিনী। ৱধবন্ধকর চাগ্রে দক্ষিণে মৃত্যুদায়িনী॥” (জ্যোতিস্তত্ব) যোগিনী প্রতিপদ ও নবমীতে পুর্ব্বে, তৃতীয়া ও একাদশীতে অগ্নিকোণে, পঞ্চমী ও ত্রয়োদশীতে দক্ষিণে, চতুৱী ও দ্বাদশীতে নৈঋত কোণে, ষষ্ঠ ও চতুর্দশীতে পশ্চিমে, সপ্তমী ও পুশিমাতে বাযুকোণে, দ্বিতীয় ও দশমীতে উত্তরে, অষ্টমী ও অমাবস্তাতে ঈশানে অবস্থান করে। যাত্রাদি শুভকার্য্যে যোগিনীর শেষ ৯ ও পরিবর্জনীয়। দক্ষিণ ও সম্মুখস্থ যোগিনীতে যাত্রা করিলে বধৱন্ধনাদি হয়, এবং বাম ও পৃষ্ঠস্থ যোগিনীতে গমন করিলে সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়।

কোন কোন স্থানে মাত্র আটজন যোগিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়, এঁরা হলেন- শৈলপুত্রী, চণ্ডঘণ্টা, স্কন্দমাতা, কালরাত্রি, চণ্ডিকা, কুষ্মাণ্ডী, কাত্যায়নী, মহাগৌরী। অন্যমতে- এরা সংখ্যায় ৬৪ জন। বিভিন্ন সময় এঁরা দেবীকে সাহায্য করেন বা তাঁর উপদেশ অনুসারে কাজ করেন। এই কারণে, দুর্গাপূজার সময় এই ৬৪ যোগিনীর পূজা করার বিধি আছে। এই মতে- প্রাথমিকভাবে আটজন যোগিনীর নাম উল্লেখ করা হয় এবং প্রত্যেকের যোগিনীর অধীনে আরও আটজন যোগিনীর নাম পাওয়া যায়। যেমন–
ভদ্রকালীর অষ্টযোগিনী: জয়ন্তী, মঙ্গলা, কালী, ভদ্রকালী, কপালিনী, দুর্গা, শিবা, ক্ষমা এবং ধাত্রী।

উগ্রচণ্ডার অষ্টযোগিনী: কৌশিকী, শিবদূতী, হৈমবতী, ঈশ্বরী, শাকম্ভরী, দুর্গা, মহোদরী এবং উগ্রচণ্ডা।

উমার অষ্টযোগিনী: জয়া, বিজয়া, মাতঙ্গী, ললিতা, নারায়ণী, সাবিত্রী, স্বধা, এবং স্বাহা।

তিথি বিশেষে যোগিনীরা এক একদিকে অবস্থান করেন। এঁদের অবস্থান অনুসারে জ্যোতিষী চক্র অর্থাৎ যোগিনী চক্র নির্ধারণ করা হয়। এই অবস্থানগুলো হলো- প্রতিপদ নবমীতে পূর্বদিকে, তৃতীয়া ও একাদশীতে অগ্নিকোণ, পঞ্চমী ও ত্রয়োদশীতে দক্ষিণে, চতুর্থী ও দ্বাদশীতে পশ্চিমে ও পূর্ণিমাতে বায়ুকোণ, দ্বিতীয়া ও দশমীতে উত্তরে, অষ্টমী ও অমাবস্যাতে ঈশানে যোগিনী বাস করেন। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট অষ্টযোগিনী হলেন- সুরসুন্দরী, মনোহরা,

কনকাবতী, কামেশ্বরী, রতিসুন্দরী, পদ্মিনী, নটিনী, মধুমতী। (মহর্ষি গৌতমের স্ত্রী অহল্যা থেকে জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও অপরাজিতা নামে চার কন্যার জন্ম হয়. তাঁরা সকলেই উমা-সতীর সহচরী ছিলেন। শিবঘরণী সতী জয়ার কাছে দক্ষ যজ্ঞের বিবরণ শ্রবণ করেছিলেন।- বামনপুরাণ)
যোগিনীরা হলেন দেবীদুর্গার কায়ব্যুহ স্বরূপা যখন যে শক্তিতত্ত্বকে কেন্দ্র করে পূজাকর্ম পরিচালনা করা হয়, তখন সেই প্রধান দেবী শক্তির কায়ব্যুহ স্বরূপা যোগিনীগণকেও পুজো করতে হয়, কারণ এঁরা মূল দেবী শক্তির অংশসম্ভুতা মাতৃকাগণ বা যোগিনী শক্তি বিশেষ। যোগিনী শক্তিরা কল্যাণদায়িনী, অখণ্ডের খণ্ডশক্তি বিশেষ। মূলশক্তিকে নির্ধারিত কর্মসাধন করতে সর্বাঙ্গশে সহায়তা করে শুভফল দান করে থাকেন। যেমন - দেবী দূর্গা চণ্ডী মহাশক্তি চামুন্ডা ও কালীর সাহায্যে রক্ত বীজের নিপাত করেন। যোগিনী মাতৃকাগণ সকলেই দেবী মহাশক্তির অংশসম্ভুতা। অংশ সম্ভুতা যোগিনীগণের আবার কোটি কোটি যোগিনী আছেন। ৬৪ যোগিনী সৃষ্টিতে প্রকৃতিতত্ত্বের ৬৪ কলা বা ভাগ, এঁরা সব ভৈরবী শক্তি।

ভারতে চৌষট্টি যোগিনীর (৬৪জন কিংবদন্তী যোগিনীর নামে নামকৃত) চারটি প্রধান মন্দির রয়েছে, উড়িষ্যাতে দুটি এবং মধ্যপ্রদেশে দুটি। উড়িষ্যাতে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক যোগিনী মন্দিরগুলির মধ্যে একটি নবম শতাব্দীর ছাদবিহীন চৌষট্টি যোগিনী মন্দির, এটি ভুবনেশ্বরের ১৫ কিমি দক্ষিণে খুরদা জেলার হীরাপুরে অবস্থিত। উড়িষ্যার আরেকটি ছাদবিহীন চৌষট্টি যোগিনী মন্দির বোলাঙ্গীর জেলার তিতীলগড়ের কাছে রাণীপুর-ঝড়িয়ালের চৌষট্টি যোগিনী পীঠ। এই মন্দির থেকে ৬৪ যোগিনীর দুটি ছবি হারিয়ে গেছে।

মধ্যপ্রদেশে দুটি উল্লেখযোগ্য যোগিনী মন্দির ছত্রপুর জেলার ছত্রপুরের খাজুরাহো মন্দিরের পশ্চিমাঞ্চলের দক্ষিণ-পশ্চিমে নবম শতাব্দীর চৌষট্টি যোগিনী মন্দির এবং দশম শতাব্দীর চৌষট্টি যোগিনী মন্দির, জব্বলপুর জেলার জব্বলপুরের কাছে ভেড়াঘাটে অবস্থিত।

চারটি যোগিনী মন্দিরের মধ্যে যোগিনী ভাবের মূর্তিগুলি অভিন্ন নয়। হীরাপুরে মন্দিরে, সব যোগিনী মূর্তি তাদের বাহন (শকট) এবং স্থায়ী ভঙ্গিমায় রয়েছে। রাণীপুর-ঝড়িয়াল মন্দিরে যোগিনী মূর্তিগুলি নৃত্যরত ভঙ্গিমায় রয়েছে। ভেড়াঘাট মন্দিরে, যোগিনী মূর্তিসমূহ ললিতাসন-এ বসে আছেন।

চৌষট যোগিনী মন্দির, জাবালপুর, মধ্যপ্রদেশ-চৌষট যোগিনী মন্দিরটি ভারতের অন্যতম একটি ঐতিহাসিক স্থান। এটি দশম শতকে কালাচুরি রাজত্ব কালে নির্মিত। মন্দিরটির গঠন অনেকটা খাজুরাহের মন্দিরগুলোর মত। মন্দিরটি দুর্গা দেবী এবং তাঁর ৬৪ জন যোগিনীর উদ্দেশ্যে নির্মিত। মন্দিরটি নর্মদা নদীর কুলে অবস্থিত। মন্দিরের কাছেই ভেদাঘাট মার্বেল পাথরের পাহাড় অবস্থিত। মন্দিরটি মধ্যপ্রদেশের জাবালপুর থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে।বর্তমানে মন্দিরের বেশ কিছু অংশ ধ্বংস প্রাপ্ত যা মুঘল রাজারা ধ্বংস করেছে।

এ মন্দিরটির নির্মাণ কাল দশম শতকে। ধারনা করা হয় কলচুরি রাজারা এটির নির্মাণ করেছেন। মন্দিরে নির্মাণ গ্রনাইট শিলা দিয়ে। মুঘল রাজত্ব আমালে মুঘল লুটপাটকারীরা মন্দিরের অনেক ক্ষতি সাধন করেছে। মন্দিরটি পাহাড়ের শীর্ষে নির্মিত। মন্দিরে পৌছাতে হলে ১৫০ ধাপ সিঁড়ি অতিক্রম করা লাগে। সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের কালে যখন আলোক রশ্মি মন্দিরের উপর পরে তখন মন্দির এবং মন্দিরের অভন্তরস্থ মাতা পার্বতী ও শিব মূর্তি দেখলে এক স্বর্গীয় অনুভূতি সৃষ্টি হয়। এছাড়া মন্দিরে মহাদেবের ষাঁড় নন্দীরও মূর্তি রয়েছে। এছাড়া

সমস্ত মন্দিরে বৃত্তাকার ভাবে ৬৪ জন যোগিনীর মূর্তিও খোদাই করা রয়েছে যারা প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গিমায় দেখানো হয়েছে।

এছাড়াও উত্তরাখন্ডের জ্যোতির বা জোশী মঠে ৬৪ যোগিনীর বিগ্রহ চিত্তাকর্ষক ,তার সাথেই পশ্চিম বঙ্গের কোন্ননগরে রাজরাজেশ্বরী সেবা মঠে ৬৪ যোগিনীর সুন্দর প্রস্তর নির্মিত বিগ্রহ মনে আনন্দ আনে।
চিন্ময়ী দুর্গার নানা মূর্তির ভিতরই এই যোগিনীদের আত্মপ্রকাশ। দুর্গাঘটের নিম্নে যে অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত হয় তার প্রতি দলে আটটি করে মোট চৌষট্টি যোগিনী পূজার বিধান আছে।

কালিকা পুরাণে দেখতে পাই চৌষট্টি যোগিনীর বিভিন্ন নাম, যথা-১। ব্রহ্মাণী। ২। চণ্ডিকা ৩। রৌদ্রী ৪। গৌরী। ৫। ইন্দ্রাণী ৬। কৌমারী ৭। ভৈরবী ৮। দুর্গা ৯। নারসিংহী ১০। কালিকা ১১। চামুণ্ডা ১২। শিবদুতী ১৩। বারাহী ১৪। কৌশিকী ১৫। মাহেশ্বরী ১৬। শঙ্করী ১৭। জয়ন্তী ১৮। সর্বমঙ্গলা ১৯। কালী ২০। করালিনী ২১। মেধা ২২। শিবা ২৩। শাকম্ভরী ২৪। ভীমা ২৫। শাম্ভা ২৬। ভ্রামরী ২৭। রুদ্রাণী ১৮। অম্বিকা ২৯। ক্ষমা ৩০। ধাত্রী ৩১। স্বাহা ৩২। স্বধা ৩৩। অপর্ণা ৩৪। মহাোদরী ৩৫। ঘোররুপা ৩৬। মহাকালী ৩৭। ভদ্রকালী ৩৮। কপালিনী ৩৯। ক্ষেমঙ্করী ৪০। উগ্রচণ্ডা ৪১। চন্ডা ৪২। চণ্ডনায়িকা ৪৩। চামুণ্ডা ৪৪। চণ্ডবতী ৪৫। চণ্ডী ৪৬। মহামাোহা ৪৭। প্রিয়ঙ্করী ৪৮। বলবিকরিণী ৪৯। বলপ্রমথিনী ৫০। মদনাোন্মথিনী ৫১। সর্বভূতদমনী ৫২। উমা ৫৩। তারা ৫৪। মহানিদ্রা ৫৫। বিজয়া ৫৬। জয়া ৫৭। শৈলপুত্রী ৫৮। চণ্ডিকা ৫৯। চন্দ্রঘণ্টা ৬০। কুষ্মাণ্ডা ৬১। স্কন্দমাতা ৬২। কাত্যায়নী ৬৩। কালরাত্রি ৬৪। মহাগৌরী।

দেবী ভাগবতে আছে, দক্ষ যজ্ঞে শিবপ্রাণা সতী দেবীর দেহত্যাগের পর আশ্বিনের শুক্লাষ্টমীতে জগন্মাতা কোটিযোগিনী বৃন্দের দ্বারা পরিবৃতা ষোড়শ প্রলয়ঙ্করী ভদ্রকালী রূপে আবির্ভূতা হয়ে দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করেন। তাই জগদম্বিকা দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী রূপেও বন্দিতা। আজও শারদীয়া মহা পূজা প্রাঙ্গণে ধ্বনিত হয়–

“ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিনীমহাঘোরায়ে-যোগিনীকোটি-পরিবৃতায়ে ভদ্রকাল্যৈ হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ।”

এইসব যোগিনী মাতৃকাদের আরাধনা যে অনেক প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত তার সাক্ষ্য বহন করে আসছে ইলোরার বিখ্যাত কৈলাস মন্দিরের পাথরের গুহায় খোদাই করা মাতৃ মূর্তিগুলো।

হিন্দু ঐতিহ্যে, যোগিনী বলতে সেইসব নারীদের বোঝানো হয় যারা হিন্দু ঐতিহ্যের যোগশাস্ত্রের অংশ এবং যারা গোরক্ষনাথ-প্রবর্তিত নাথ যোগী ঐতিহ্যের অংশ ছিলেন। কয়েকটি প্রসঙ্গে, যোগিনী, দেবী পার্বতী-সূত্রে অবতীর্ণ পবিত্র নারীশক্তির অংশ হিসাবে উল্লিখিত হন, এবং ভারতে যোগিনী মন্দিরগুলিতে আটজন মাতৃকা বা চৌষট্টিজন যোগিনী হিসাবে সম্মানিত হন।

যোগিনী হিসাবে এমন নারীদেরও উল্লেখ করা হয়, যারা হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্রের ঐতিহ্যের অংশ। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে, মিরান্ডা সাউ বলেন যে ডোম্বিযোগিনী, সহজযোগিচিন্তা, লক্ষ্মীঙ্করা, মেখলা, কঙ্কাল গঙ্গাধরা, সিদ্ধরাজ্ঞী ও অন্যান্যদের মত প্রচুর নারীরা সম্মানিত যোগিনী এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানচর্যার পথের প্রাগ্রসর অন্বেষক ছিলেন। তিব্বতি বৌদ্ধধর্ম এবং বোন ঐতিহ্যে, ব্যবহারিকভাবে, ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের মহাসিদ্ধ যোগিনীদের সাথে কিছু নিগম তুলনীয়।

যোগী এবং তাদের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের প্রাথমিক সাক্ষ্য, কারল ওয়ার্নারের মতে, বেদের কেশীন সূক্তে পাওয়া যায়, যেখানে এই যোগীগণ প্রশংসিত হন। যাইহোক, এখানে উল্লেখ নেই যে এই বৈদিক যুগের যোগীরা নারীদের অন্তর্ভুক্ত করতেন কিনা। পণ্ডিতরা মনে করেন যে, কিছু প্রাচীন বৈদিক ঋষি ছিলেন নারী।একজন মহিলা ঋষি ঋষিকা নামে পরিচিত হন।

যোগিনী শব্দটি গোরক্ষনাথ প্রতিষ্ঠিত নাথ যোগী ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত একজন নারীকে বোঝাতে উল্লেখ করা হয়েছে।তাঁরা সাধারণত শৈব ঐতিহ্যের অন্তর্গত, কিন্তু কিছু নাথ বৈষ্ণব ঐতিহ্যের অন্তর্গত। উভয় ক্ষেত্রে, ডেভিড লরেনজেন বলেন যে, তাঁরা যোগ অনুশীলন করেন এবং তাদের প্রধান ঈশ্বর নির্গুণ হতে থাকেন, ইনি এমন এক ঈশ্বর যিনি আকারবিহীন এবং অর্ধ-অদ্বৈতবাদী, মধ্যযুগীয় সময়ে হিন্দুধর্মের অদ্বৈত বেদান্ত বিদ্যালয়, বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমিক ঘরানা, সেইসাথে তন্ত্র এবং যোগাভ্যাসে প্রভাব ফেলেছিলেন। নারী যোগিনীরা এই ঐতিহ্যের একটি বৃহৎ অংশ ছিলেন, এবং অনেক ২য়-সহস্রাব্দের চিত্রকর্ম তাঁদের এবং তাঁদের যোগচর্চা সম্বন্ধে বর্ণনা করে। ডেভিড লরেনজেন বলেছেন যে, দক্ষিণ এশিয়ায় (ভারতের উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম অঙ্গরাজ্যসমূহ এবং নেপালে) গ্রামাঞ্চলের জনতার মধ্যে নাথ যোগীরা খুব জনপ্রিয়, মধ্যযুগীয় সময়ের কাহিনী ও গল্পে সমসাময়িক আবহে তাঁদের স্মরণ রাখার মধ্য দিয়ে।

কথাসরিৎসাগরের মতো মধ্যযুগীয় পুরাণে, যোগিনী যাদুশক্তিধর নারী ও পরীদের একটি শ্রেণীর নাম, যাদের বেশিরভাগ চরিত্রকে ক্বচিৎ ৮, ৬০, ৬৪ বা ৬৫ সংখ্যার হিসাবে গণনা করা হয়। হঠ-যোগ-প্রদীপিকা গ্রন্থে যোগিনীদের উল্লেখ করা হয়েছে।

বাস্তব জীবনে, যোগিনী কৌল-এর উপর ঐতিহাসিক প্রমাণ হিন্দুধর্মের যোগিনী ঐতিহ্য সম্বন্ধে ইঙ্গিত দেয়, যারা যোগশাস্ত্র ও তন্ত্রের অনুশীলন করতেন এবং, দশম শতকে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এই উন্নয়ন হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং বৌদ্ধতন্ত্রের ঐতিহ্যের মধ্যে যোগিনীকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। বেদে, উষা (ভোর), পৃথ্বী (পৃথিবী), অদিতি (মহাজাগতিক নৈতিক নিয়ম), সরস্বতী (নদী, জ্ঞান), বাক (শব্দ), নিঋতি (ধ্বংস), রাত্রি (রাত), অরণ্যানী (জঙ্গল) সহ অসংখ্য দেবীর অন্তর্ভুক্তি রয়েছে, এবং অন্যদের মধ্যে দিনশনা, রাকা, পুরমধী, পরেন্দী, ভারতী ও মহীর মতো দানশীল দেবীদের ঋগ্বেদে উল্লেখ করা হয়েছে। যাইহোক, নারীদেরকে পুরুষদের মত বারংবার আলোচনা করা হয়নি। সমস্ত দেবতা ও দেবীদের বৈদিক কালে ভাগ করা হয়, কিন্তু উত্তর-বৈদিক গ্রন্থে, বিশেষত মধ্যযুগীয় সময়ের সাহিত্যে, তাঁদেরকে শেষপর্যন্ত এক সর্বজনীন শক্তি, পরব্রহ্মের দিক বা প্রকাশ হিসাবে দেখা যায়। ভারতে চৌষট্টি যোগিনীর (৬৪জন কিংবদন্তী যোগিনীর নামে নামকৃত) চারটি প্রধান মন্দির রয়েছে, উড়িষ্যাতে দুটি এবং মধ্যপ্রদেশে দুটি। উড়িষ্যাতে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক যোগিনী মন্দিরগুলির মধ্যে একটি নবম শতাব্দীর ছাদবিহীন চৌষট্টি যোগিনী মন্দির, এটি ভুবনেশ্বরের ১৫ কিমি দক্ষিণে খুরদা জেলার হীরাপুরে অবস্থিত। উড়িষ্যার আরেকটি ছাদবিহীন চৌষট্টি যোগিনী মন্দির বালাঙ্গীর জেলার তিতীলগড়ের কাছে রাণীপুর-ঝড়িয়ালের চৌষট্টি যোগিনী পিঠ। এই মন্দির থেকে ৬৪ যোগিনীর দুটি ছবি হারিয়ে গেছে।

মধ্যপ্রদেশে দুটি উল্লেখযোগ্য যোগিনী মন্দির ছত্রপুর জেলার ছত্রপুরের খাজুরাহো মন্দিরের পশ্চিমাঞ্চলের দক্ষিণ-পশ্চিমে নবম শতাব্দীর চৌষট্টি যোগিনী মন্দির এবং দশম শতাব্দীর চৌষট্টি যোগিনী মন্দির, জব্বলপুর জেলার জব্বলপুরের কাছে ভেদাঘাটে অবস্থিত।

চারটি যোগিনী মন্দিরের মধ্যে যোগিনী ভাবের মূর্তিগুলি অভিন্ন নয়। হীরাপুরে মন্দিরে, সব যোগিনী মূর্তি তাদের বাহন (শকট) এবং স্থায়ী ভঙ্গিমায় রয়েছে। রাণীপুর-ঝড়িয়াল মন্দিরে যোগিনী মূর্তিগুলি নৃত্যরত ভঙ্গিমায় রয়েছে। ভেদাঘাট মন্দিরে, যোগিনী মূর্তিসমূহ ললিতাসন-এ বসে আছেন....

আবার আদ্যাস্তবেও আছে যোগিনীগণের অনেকের উল্লেখ, তাই আদ্যাস্তব দিলাম

আদ্যা স্তোত্র
ওঁ নম আদ্যায়ৈ

BANGL

শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি আদ্যা স্তোত্রং মহাফলমঃ।
যঃ পঠেতঃ সততং ভক্ত্যা স এব বিষ্ণুবল্লভঃ॥১॥
মৃত্যুর্ব্যাধিভয়ং তস্য নাস্তি কিঞ্চিতঃ কলৌ যুগে।
অপুত্রা লভতে পুত্রং ত্রিপক্ষং শ্রবণং যদি॥২॥
দ্বৌ মাসৌ বন্ধনান্মুক্তি বিপ্রর্বক্ত্রাতঃ শ্রুতং যদি।
মৃতবৎসা জীববৎসা ষণ্মাসং শ্রবণং যদি॥৩॥
নৌকায়াং সঙ্কটে যুদ্ধে পঠনাজ্জয়মাপ্নুয়াতঃ।
লিখিত্বা স্থাপয়েদঃগেহে নাগ্নিচৌরভয়ং ক্বচিতঃ॥৪॥
রাজস্থানে জয়ী নিত্যং প্রসন্নাঃ সর্ব্বদেবতা।
ঔং হ্রীং ব্রহ্মাণী ব্রহ্মলোকে চ বৈকুণ্ঠে সর্ব্বমঙ্গলা॥৫॥
ইন্দ্রাণী অমরাবত্যামবিকা বরুণালয়ে।
যমালয়ে কালরূপা কুবেরভবনে শুভা॥৬॥
মহানন্দাগ্নিকোনে চ বায়ব্যাং মৃগবাহিনী।
নৈঋত্যাং রক্তদন্তা চ ঐশাণ্যাং শূলধারিণী॥৭॥
পাতালে বৈষ্ণবীরূপা সিংহলে দেবমোহিনী।
সুরসা চ মণিদ্বিপে লঙ্কায়াং ভদ্রকালিকা॥৮॥
রামেশ্বরী সেতুবন্ধে বিমলা পুরুষোত্তমে।
বিরজা ঔড্রদেশে চ কামাক্ষ্যা নীলপর্বতে॥৯॥
কালিকা বঙ্গদেশে চ অযোধ্যায়াং মহেশ্বরী।
বারাণস্যামন্নপূর্ণা গয়াক্ষেত্রে গয়েশ্বরী॥১০॥
কুরুক্ষেত্রে ভদ্রকালী ব্রজে কাত্যায়নী পরা।
দ্বারকায়াং মহামায়া মথুরায়াং মাহেশ্বরী॥১১॥

ক্ষুধা ত্বং সর্ব্বভূতানাং বেলা ত্বং সাগরস্য চ।
নবমী শুক্লপক্ষস্য কৃষ্ণসৈকাদশী পরা॥১২॥
দক্ষসা দুহিতা দেবী দক্ষযজ্ঞ বিনাশিনী।
রামস্য জানকী ত্বং হি রাবণধ্বংসকারিণী॥১৩॥
চণ্ডমুণ্ডবধে দেবী রক্তবীজবিনাশিনী।
নিশুম্ভশুম্ভমথিনী মধুকৈটভঘাতিনী॥১৪॥
বিষ্ণুভক্তিপ্রদা দুর্গা সুখদা মোক্ষদা সদা।
আদ্যাস্তবমিমং পুণ্যং যঃ পঠেতঃ সততং নরঃ॥১৫॥
সর্ব্বজ্বরভয়ং ন স্যাতঃ সর্ব্বব্যাধিবিনাশনমঃ।
কোটিতীর্থফলং তস্য লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥১৬॥
জয়া মে চাগ্রতঃ পাতু বিজয়া পাতু পৃষ্ঠতঃ।
নারায়ণী শীর্ষদেশে সর্ব্বঙ্গে সিংহবাহিনী॥১৭॥
শিবদূতী উগ্রচণ্ডা প্রত্যঙ্গে পরমেশ্বরী।
বিশালাক্ষী মহামায়া কৌমারী সঙ্খিনী শিবা॥১৮॥
চক্রিণী জয়ধাত্রী চ রণমত্তা রণপ্রিয়া।
দুর্গা জয়ন্তী কালী চ ভদ্রকালী মহোদরী॥১৯॥
নারসিংহী চ বারাহী সিদ্ধিদাত্রী সুখপ্রদা।
ভয়ঙ্করী মহারৌদ্রী মহাভযবিনাশিনী॥১০॥
ইতি ব্রহ্মযামলে ব্রহ্মনারদসংবাদে আদ্যা স্তোত্রং সমাপ্তমঃ॥
॥ওঁ নমঃ আদ্যায়ৈ ওঁ নমঃ আদ্যায়ৈ ওঁ নমঃ আদ্যায়ৈ॥

BANGL

BAN OM

BANGLADARSHAN.COM

॥রাধাকৃষ্ণের রাসলীলার তাৎপর্য॥

শরৎকাল শেষ হয়ে এল। এবার বাতাসে আসন্ন শীতের আমেজ। সামনেই কার্ত্তিক হেমন্ত পূর্ণিমা। কি এই কার্ত্তিক পূর্ণিমার তাৎপর্য? আমরা দুচোখে মেখে মায়া অঞ্জন দিব্য দৃষ্টি দিয়ে অবলোকন করি। সেই রাসলীলা...

ওই যমুনার তীর। ধীরে ধীরে সাঁঝ নামছে যমুনা তীরে। পাখিরা কুলায় ফিরে...ওই যে সেই দিব্য বৃন্দাবন... যাচ্ছে সাঁঝবেলায় গোপীরাও যমুনার জলে গা ধুয়ে তাদের ঘরে ফিরে গিয়েছে। ঘরের কাজে ব্যস্ত তারা।... যমুনার আশেপাশে জঙ্গল জুড়ে নেমে আসছে ঘন অন্ধকার। সেই ঘন অন্ধকার ফুঁড়ে একসময় আকাশে ওঠে চাঁদ। আকাশকে রক্তিম আভায় রাঙিয়ে দিয়ে। এই চাঁদ সাধারণ চাঁদ নয়। বহ...গোল থালার মত ুদিন বাদে স্বামী ঘরে ফিরে এসে যেমন স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয় – এই চাঁদ যেন সেই বিরহাতুর স্বামীর প্রতিভূ। শুধু তাই নয় এ চাঁদ যেন দিব্যভাবে উদ্ভাসিত।ভানুসিংহ গাইছেন :

BANGL

গহন কুসুমকুঞ্জ মাঝে-
মৃদুল মধুর বংশি বাজে,
বিসরি ত্রাস লোক লাজে
সজনি, আও আও লো।
পিনহ চারু নীল বাস,
হৃদয়ে প্রণয় কুসুম রাশ,
হরিণ নেত্রে বিমল হাস,
কুঞ্জ বনমে আও লো॥
ঢালে কুসুম সুরভভার-,
ঢালে বিহগ সুরবসার-,
ঢালে ইন্দু অমৃতধার-
বিমল রজত ভাতিরে।
মন্দ মন্দ ভৃঙ্গ গুঞ্জে,
অযুত কুমুম কুঞ্জে কুঞ্জে,
ফুটল সজনি পুঞ্জে পুঞ্জে
বকুল যূথি জাতিরে॥
দেখলো সখি শ্যামরায়,
নয়নে প্রেম উথল যায়,

মধুর বদন অমৃত সদন
চন্দ্রমায় নিন্দিছে
আও আও সজনিবৃন্দ-,
হেরব সখি শ্রীগোবিন্দ,
শ্যামকে পদারবিন্দ–
ভানুসিংহ বন্দিছে॥

আহাকেন এই দিব্যভাব....কী দিব্যভাবে ভরে আছে হৃদয় ....?

কারণ এই কার্ত্তিক পূর্ণিমার রাতেই যে অনুষ্ঠিত হবে রসিক কৃষ্ণের রাসলীলা। 'রাস' এসেছে 'রস' থেকে। 'রস' মানে আনন্দ, দিব্য অনুভূতি, দিব্য প্রেম। 'লীলা' অর্থ নৃত্য। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে লীলা করবেন।

'চীরহরণের' বা বস্ত্রহরণের পর গোপীদের সঙ্গে তাঁর এই লীলা। গোপীরা অধীর অপেক্ষা করছে কবে তাদের ডাক আসবে তাদের প্রাণপ্রিয়সখা শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে।

ডাক আসবে নিশ্চয়ই । তাই আজ কার্ত্তিক পূর্ণিমায় ঐ সুগোল চাঁদের মায়াময় নরম আলো ছড়িয়ে পড়েছে বনাঞ্চলে। রক্তিম চাঁদকে দেখে মনে পড়ে যাচ্ছে রাধারাণীকে। অমনই সুন্দর চাঁদপানা মুখ রাধারাণীর।

এই হেমন্তিকা রাত, এই চাঁদ, চারিদিক মাতাল করা মল্লিকার গন্ধ – এসব কিছুই সাধারণ নয়, এক দিব্যভাবে স্নাত – অলৌকিক এক মায়ায় আচ্ছন্ন। ভগবান কৃষ্ণ যখন দেখলেন ঐ পূর্ণচন্দ্র ধীরে ধীরে রক্তিম থেকে গৈরিক বর্ণ ধারণ করল এবং সমগ্র অরণ্য প্লাবিত হল জ্যোৎস্নায় তখন তিনি তাঁর হাতে তুলে নিলেন মোহন বাঁশি। ফুঁ দিলেন বাঁশিতে। মধুর বংশীধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল বনে বনাঞ্চলে, যমুনার তীরে আমাদের বাংলার কবি লিখেছেন।...
:

আজি মুরলী বাজে প্রেমবৃন্দাবনে-
নব অনুরাগিনী শ্যামসোহাগিনী
অভিসারে চলে রাধা কুঞ্জবনে।
কোকিলা কুহু কুহু গাহে তরুশাখে,
নীল অঞ্চলে রাধা মুখশশী ঢাকে-
সুরভিত বনতলে ফুল্ল কুসুমদলে
মোহিত অলিকুল গুঞ্জরণে।
মধুঋতু বসন্তে গাহে ব্রজনারী,
হে চিরসুন্দর হে গিরিধারী-

দাও প্রিয় দরশন অন্তরে অনুক্ষণ
রাধার জীবনসখা মধু মিলনে।

ওহ্, কি মধুঢালা সে সুরসেই মন মাতাল করা সুর শোনা মা !ত্রই গোপীদের মন উন্মনা হল। আশ্চর্য এই সুর কেবল গোপীরাই শুনতে পেল, যারা কৃষ্ণপ্রেমে পাগল – কৃষ্ণ যাদের প্রাণপ্রিয়সখা।। আর কেউ শুনতে পেল না সেই সুর। এমনকি মা যশোদাও নন। এই সুর এমনই সুর যা গোপীদের তীব্রভাবে আকর্ষণ করল। যেন এই সুর আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলল গোপীদের আর রশির মত টেনে নিয়ে আসতে লাগল তাদের কানহাইয়ার দিকে। বৃন্দাবনের সকল তরুণী গোপী যারা কৃষ্ণের প্রেয়সী – তাদের মন বাঁধা পড়ল কানহাইয়ার সাথে। তারা একে অপরের মনোভাব না জেনেই ছুটে চলল সেই বাঁশির সুরের অনুসন্ধানে। কোথায় কৃষ্ণ?

কৃষ্ণের এই বাঁশির সুর ছিল 'অনঙ্গ বর্দ্ধনম'। কেউ যদি ভগবানকে স্পর্শ করার জন্য উন্মুখ হয় বা খাওয়াবার জন্য ব্যাকুল হয় কিংবা ভগবানের কাছ থাকে আনন্দ পেতে চায় বা তাঁকে আনন্দ দিতে চায়, তখন তাকে বলে অনঙ্গ। 'অনঙ্গ' কথাটির আক্ষরিক অর্থ 'কাম'। কিন্তু গোপীদের সম্পর্কে অনঙ্গ শব্দের এমন স্থূল অর্থ করা অপরাধ।এখানে আরেকটু কথা আছেসেই কামদেব বা মদনদেব যাকে মোহিত করে কৃষ্ণের ....অনঙ্গ কামদেবের আরেক নাম .... ভগবত ....আরেক নাম মদনমোহন। সুন্দরানন কৃষ্ণ তাকে আহ্বান করেছেন রাসলীলায়। কেন আহ্বান করেছেন .....পুরাণ বলছে

ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতাদের জয় করার পর কামদেবের অহংকার প্রবল উচ্চতায় পৌঁছেছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কামদেবকে শীতের আগের ঋতুতে শারদ পূর্ণিমার রাতে বৃন্দাবন দেখার জন্য আমন্ত্রণ (পূর্ণিমার রাতে) জানিয়েছিলেন এবং তাকে বলেছিলেন যে সেই দিব্য রাতে তিনি কোটি কোটি গোপীর সঙ্গ উপভোগ করবেন। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "যদি তাদের কারো প্রতি আমার সামান্যতম আবেগও থাকে তবে তুমি জিতবে, অন্যথায় তুমি হেরে যাবে।"

রাধা ছিলেন কৃষ্ণের মামী।তিনি কৃষ্ণকে রক্ষা করতেন।যোগমায়া দুই ধরনের।ঐশ্বর্য ও মাধুর্য।ভগবান বিষ্ণু গোমাতা পছন্দ করতেন।তাই গোকুলে থাকার সিদ্ধান্ত নেন। গোপীরা নিঃস্বার্থ প্রেমের আধার । তারা পূর্বজন্মে ঋষি ছিলেন। সাত বছর বয়সী ভগবান কৃষ্ণ প্রথম গোপীদের পরীক্ষা করেছিলেন যে তাদের প্রেম আবেগপ্রবণ ক্ষনিকের নাকি স্থায়ী ছিল। গোপীরা তাদের ঘরের কাজ ফেলে কৃষ্ণের সাথে দেখা করতে যেতেন, ক্রন্দন রত শিশুসন্তানদের ফেলে রেখে ছুটে যেতেন কৃষ্ণের বাঁশি কর্ণগোচর হলে সেই ঠাকুরের তিন টানের এক হবার) রাসলীলা শুরু করার আগে কৃষ্ণ কালিয়া সর্পকে অপসারণ করেছিলেন। মাধুর্য বিদ্যার অধিশ্বরী ।(কথা আসছে ও মানুষের জীবাত্মাকে মিলিত হতে সাহায্য (পরমাত্মা) যোগমায়া রাসেশ্বরী রাধা মহারাসের রাতে ঈশ্বর করেছিলেন। এই রাতটি ছিল যোগ রাজ্য অর্জনের জন্য অর্থাৎ যোগযুক্ত হয়ে পরমাত্মার সঙ্গে সংযুক্ত হবার

উদ্দেশ্যে । প্রতিটি গোপীর জন্য আলাদা কৃষ্ণ ছিল, পূর্ণিমার রাতে মহারাস ছিল। কৃষ্ণ গোপীদের বৃত্তের কেন্দ্রে ছিলেন।সুরদাসজী তাঁর পদে বর্ণনা করছেন :

আরে হো মোহন রচো অদ্ভুত !রাস রে!
সঙ্গ মিলি বৃষভানু তনয়া
গোপিকা চহু প্রকাশ রে।
এক হী সুর সকল মোহে,
মুরলী সুধা পরকাশ রে
জল হী থলকে জীব থকি রহে
মুনিনি মনহি উদাস রে।
চকিত ভয়ো সমীর সুনিকে
যমুনা উল্টি ধার রে
*সুরপ্রভু ব্রজধাম মিলিবন *
নিসা করত বিহার রে।

(কথিত আছে সুরদাস ছিলেন দৃষ্টিহীন, কৃষ্ণ ভাবে বিভোর পুষ্টিমার্গী বল্লোভাচার্যের শিষ্য, তাঁর লেখা পদে দুভাবে শেষ হয়, হয় বলে *সুরদাস* আর নয়তো #সুর# বলে, যেগুলো সুর বলে শেষ হয়েছে সেগুলো শ্রীকৃষ্ণ নিজে এসে লিখে দিয়ে গেছেন যেমন এখানে) কথিত আছে,ভগবান শঙ্করও গোপীর ছদ্মবেশে 'মহারাস' দেখতে এসেছিলেন তাই 'গোপীশ্বর' নামকরণ হয়েছে তাঁর। গোপীরা রাধাকে কৃষ্ণের সাথে দেখা করতে উৎসাহিত করতেন কারণ তারা সকলেই এই অভিজ্ঞতার অংশীদার হতে চাইতেন।গোপীরা সকালে সেই জায়গাগুলি পরিষ্কার করতেন, যেখানে কৃষ্ণ শেষ রাতে বনে সময় কাটাতেন। কৃষ্ণ রাধার অসুবিধা কমানোর চেষ্টা করেছিলেন, যখন তিনি রাধার কেশ সজ্জা করে দিতেন। কৃষ্ণ অদৃশ্য হয়ে যেতেন তখন, যখন গোপীদের অহংকার জন্মাতো ।

কৃষ্ণ গোপীদের মাখনের হাঁড়ি ভাঙতেন যখন তারা হাঁড়ি নিয়ে যেত ননী বিক্রয় করতে, কিন্তু তারা কখনও পথ পরিবর্তন করেননি। গোপীনীরা কাত্যায়নী দেবীর পূজা করেছিলেন এবং ছাপ্পান্নটি খাবার তৈরি করেছিলেন। প্রতিদিন আটটি বিভিন্ন ধরণের খাবার গোবর্ধনকে দেওয়া হয়েছিল। সাত দিনের ক্ষুধায় কৃষ্ণকে ছাপ্পান্ন রকমের খাবার সরবরাহ করেছিলেন মাতা যশোদা ।

কৃষ্ণ বনের আগুন থেকে গোপীদের রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু গোপীরা কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন কীভাবে বিচ্ছেদের আগুন এড়ানো যায়। গোপীরা ভবিষ্যৎতে আসা রাক্ষসদের উল্লেখ করেছেন।

একবার রাধাকে সত্যভামা ভুলবশত গরম দুধ দিয়েছিলেন এবং কৃষ্ণ সেই গরম দুধের তাপে রাধার যে ব্যথা, সেটা ব্যথা অনুভব করেছিলেন। এমনকি কোটি কোটি গোপীর মধ্যেও, যারা তাদের সমস্ত কিছু তাঁর কাছে উৎসর্গ করতে আগ্রহী, ভগবান কামনা, অনুভূতি এবং এমনকি কর্ম থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত ছিলেন, তাদের সব দায় নিয়েছিলেন কৃষ্ণ । এইভাবে ভগবান কামদেবকেও পরাজিত করেন এবং তার অহংকার দূর করেন।তপস্যার পর নৃত্য ছিল স্বাভাবিক ফল।

মহামায়া পার্বতী রাধার প্রধানা অষ্টসখীর একজন ললিতা , তিনি এই রাস প্রত্যক্ষ করতে আসবেন বলে শঙ্করের কাছে অনুমতি চাইলে অনুমতি দিলেন শংকর আর নিজেও গোপীর ছদ্মবেশে এলেন সেই রাস দেখতে যে এমন কী মহাভাবের রাস যাতে থাকার জন্য পার্বতী কৈলাস ছেড়ে এলেন বৃন্দাবনে?আবার গোপীরা ছাড়া রাসমন্ডলে থাকার অনুমতি আর কারো ছিল না। কারণ গোপীদের নিষ্কাম নিঃস্বার্থ প্রেমেরই যে বশ একমাত্র কৃষ্ণ। গোপীর রূপে শঙ্কর নটবরের সাথে নৃত্য করেছিলেন।কিন্তু যেই রাধারাণী বুঝলেন শঙ্করের উপস্থিতি (নটরাজ), উনি রাসমন্ডল পরিত্যাগ করলেন আর রাধা বিনা শ্যাম কী কখনো থাকতে পারেন, তাই শ্যামও ত্যাগ করলেন রাসমন্ডল আর সঙ্গে সঙ্গে পরিসমাপ্তি ঘটল রাসলীলার। রাসবিহারী আর রাসেশ্বরী ছাড়া কেমন করে হবে রাসলীলা?

এই গল্পটি বর্ণনা করার উদ্দেশ্য শুধু এই যে, সাধারণ মানুষ যেন ভগবান কৃষ্ণের প্রতি গোপীদের নিঃস্বার্থ প্রেমের প্রতিফলন দেখে অনুভব করে তাঁদের অনুসারী হয়।

কৃষ্ণের প্রতি তাদের প্রেম আধ্যাত্মিক - জাগতিক নয়। তাদের সবটুকু দিয়ে তারা কৃষ্ণকে ভালবেসেছে। সেখানে কোন স্বার্থ নেই, কোন দ্বন্দ্ব নেই। তাই কৃষ্ণের বাঁশি তাদের সেই প্রেমকে আরো আরো ঘনীভূত করেছে। যেমন ধোঁয়ার আড়ালে আচ্ছাদিত আগুন বাতাস লাগলে যেভাবে দ্বিগুণবেগে প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি গোপীরা কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে উঠল।

বাঁশি যেন বলছে, ‘সখীরা, তোমরা তাড়াতাড়ি এসো। আমি তোমাদের জন্য আকুলভাবে অপেক্ষা করে চলেছি। এই স্থান - এখানে কোন জনমানব নেই - নির্জনতায় ঢাকা - নিশীথ রাত্রি এখানে বড় মায়াময় - মল্লিকার সৌরভে আর চাঁদের আলোয় এই স্থান যেন প্লাবিত হচ্ছে। ওগো, গোপীগণ, তোমরা যে যেখানে যে অবস্থায় আছো, চলে এসো’।

হরিবংশে ও ভাসের বালচরিতে উল্লেখ আছে যে, কৃষ্ণ গোপিনীদের সঙ্গে হল্লীশনৃত্য করেছিলেন। হল্লীশনৃত্য যদি তালযুক্ত ও বিবিধ গতিভেদে বৈচিত্র্যপূর্ণ হয় তবে তাকেনামে অভিহিত করা হয়। বিষ্ণুপুরাণের মতে "রাস", কৃষ্ণ রাস অনুষ্ঠান করেছিলেন গোপরমণীদের সঙ্গে। শ্রীধর স্বামী বলেছেন, বহু নর্তকীযুক্ত নৃত্য বিশেষের নাম রাস- “রাসো নাম বহু নর্ত্তকীযুক্তে নৃত্যবিশেষঃ।” শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যতম টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেছেন, –“নৃত্যগীতচুম্বনালিঙ্গনদীনাং রসানাং সমূহো রাসস্তন্ময়ী যা ক্রীড়া বা রাসক্রীড়া”। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে, কৃষ্ণ

যোগমায়াকে সমীপে গ্রহণ করেই রাস অনুষ্ঠান করেছিলেন। বস্ত্রহরণের দিন গোপিনীদের কাছে কৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, পরবর্তী পূর্ণিমা তিথিতে তিনি রাসলীলা করবেন-

"যখন করেন হরি বস্ত্রহরণ।
গোপীদের কাছে তিনি করিলেন পণ।।
আগামী পূর্ণিমাকালে তাঁহাদের সনে।
করবেন রাসলীলা পুণ্য বৃন্দাবনে।।"

বাঁশির সুর চুম্বকের মত আকর্ষণ করল গোপীদের। তারা কেউ কেউ গোরুর দুধ দুইছিল, কেউ বা উনুনে দুধ গরম করছিল। যেই বাঁশির সুর কানে গেল অমনি তারা দুধ দোওয়া ফেলে ছুটল – গোরুর পা বাঁধা রইল, বাছুরটিকে মায়ের কাছে এনে দিতে ভুলে গেল, উনুনে দুধ উথলে উঠল – না, কোন দিকে নজর নেই – সব ছেড়ে গোপীরা ছুটল। কর্মত্যাগ হল তাদের – যতিকর্ম ত্যাগ।

কেউ কেউ আবার পতিসেবা করছিল বা সান্ধ্য আহার প্রস্তুত করছিল অথবা প্রসাধন করছিল, অঙ্গরাগে অঙ্গমার্জনা করছিল বা পোশাক পরিধান করছিল – সব কাজ তাদের অসম্পূর্ণ রইল – তারা ধাবিত হল কৃষ্ণসন্দর্শনে। তাদের লোকত্যাগ হল অর্থাৎ পরিবার পরিজন আর তাদের আপন রইল না।

কেউ কেউ দুগ্ধপানরত ছোট শিশুকে ফেলে ছুটল – পড়শী, পরিজনরা বলল পাষাণী মা – গোপীদের কানে গেল না সেকথা – তারা শিশু ফেলে ছুটল। স্নেহ বা প্রেম ত্যাগ হল তাদের।

কেউ কেউ ছুটল ভোজন ত্যাগ করে। আবার কেউ বা বস্ত্র অলংকার পরিধান করছিল। সেসব অসমাপ্ত রইল। আলুথালু বেশভূষা নিয়েই তারা ছুটল কৃষ্ণসকাশে। দেহস্মৃতি বা দেহবোধও ত্যাগ হল তাদের। সর্বস্ব ত্যাগ করে গোপীরা ছুটল। কেউ তাদের ধরে রাখতে পারল না। তীব্র স্রোতের অভিমুখে যেভাবে নৌকা ধাবিত হয়, সেইভাবে গোপীরাও কৃষ্ণ অভিমুখে ধাবিত হল। তারা সংসার ধর্ম ত্যাগ করল, লোকত্যাগ করল, স্নেহ ও জাগতিক প্রেমও ত্যাগ করল। তাদের মন প্রাণ জুড়ে কেবল কৃষ্ণ। আর কিছু জানে না তারা, কেবল কৃষ্ণকেই জানে। ভগবানকে পেতে গেলে এভাবেই তো সর্বস্ব ত্যাগ করতে হয়। তা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের পরীক্ষা করার জন্য বললেন, এই যে তোমরা এই রাতে পরিবার পরিজন সংসার ছেড়ে চলে এলে – এ তোমরা ঠিক করো নি। তোমরা ফিরে যাও।

কৃষ্ণের মুখে এই কথা শুনে গোপীরা স্তম্ভিত হয়ে গেল। ‘হে নাথ তোমার চরণস্পর্শ যে একবার লাভ করেছে তার কাছে এইসব জাগতিক বন্ধন যে মিছে। আবার যদি আমাদের সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয় সে তো আমাদের চরম দুর্ভাগ্য হবে প্রাণনাথ’। শ্রীকৃষ্ণ এবার হাসলেন, বুঝলেন গোপীদের এই প্রেম নিখাদ, খাঁটি। তাই তিনি

বললেন, ‘তোমাদের এই অহৈতুকি প্রেমের প্রতিদান আমি কখনই দিতে পারব না। আমি তোমাদের কাছে চিরঋণী থাকব’।

কৃষ্ণ এবার গোপীদের সঙ্গে নৃত্যগীতে নিবিষ্ট হলেন। গোপীরা কৃষ্ণের সান্নিধ্যলাভ করে ধন্য হল। কৃষ্ণের নিবিড় সান্নিধ্য কিন্তু গোপীদের মধ্যে জন্ম দিল আত্মম্ভরিতা - তারা মনে করল তারাই অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী যে কৃষ্ণপ্রেমে অবগাহন করতে পেরেছে। এই আত্মম্ভরিতা দূর করার জন্য কৃষ্ণ অকস্মাৎ গোপীদের মধ্য থেকে অন্তর্হিত হলেন। কানহা অদৃশ্য হওয়ায় গোপীদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।অন্তরে তীব্র বিরহ জ্বালা নিয়ে তারা কৃষ্ণকে খুঁজে বেড়াতে লাগল। ওগো নদীতীর, তরুদল তোমরা বলে দাও কৃষ্ণ কোথায়? আমাদের শ্যামকে এনে দাও।

নবদূর্বাদলশ্যামকে খুঁজতে খুঁজতে তারা একসময় দেখতে পেল কৃষ্ণের পদচিহ্ন। কৃষ্ণের পদচিহ্নের পাশে পাশে এ কোন রমণীর পায়ের ছাপ আমাদের শ্যাম তবে রাধাকে নিয়ে অন্তর্হিত !এ তো শ্রীরাধিকা ! হয়েছেন?রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি দর্শন করার জন্যই যে গোপীদের গোপীজন্ম ঝুলায় ঝুলে যাত্রা যুগলের.... রাসযাত্রা ...অনেকগুলো, দোলযাত্রা, ঝুলন যাত্রা: রাসলীলায় দোলায় বসে দুলছে যে শ্যামরাই....

BANGLADARSHAN.COM

কুসুম দোলায় দোলে শ্যামরায়,
তমাল শাখে দোলা ঝুলে ঝুলনে।
শ্যামেরই পাশে শ্রীমতী হাসে,
যুগল শশী যেন বৃন্দাবনে॥
*দোলে কৃষ্ণ মেঘের ওই সৌদামিনী,
হিন্দোলে দেয় দোল ব্রজগোপিনী।
বাজায় নুপূর, নাচে ময়ূরী ময়ূর,
যমুনা উজান বয় ভরা শাওনে॥
*দোলে কুঞ্জবনে দুঁহু রঙ্গে বিভোর,
মন জানে কে বা চাঁদ কে বা চকোর।
ওই রূপমাধুরী আঁখি করেছে চুরি,
শ্রীমতীশ্যাম দোলে আমারি মনে।।-

কৃষ্ণ রাধারাণীকে নিয়ে গভীর বনমধ্যে কোথায় হারিয়ে গেলেন? রাধা, পরম সৌভাগ্যবতী রাধা কানহাইয়ার সঙ্গে একাই রাসলীলার আনন্দ উপভোগ করলেন? পরমানন্দ দাসজী লিখছেন :

কুঞ্জ ভবন মে মঙ্গলাচার,
নব দুলহণ বৃষভন নন্দিনী ,
দুলহে ব্রজরাজ কুমার ॥১॥
নয়ে নয়ে পুষ্পকুঞ্জ কে তোরণ,
নব পল্লবী বন্দনাভার,
ছরী রচি কাদম্ব খান্ডি মেন,
সঘন লতা মণ্ডপ বিস্তার ॥২॥
করত বেদ ধ্বনি বিপ্র মধুপ গণ
কোকিলা গণ গাবত অনুসার.
দিনি ভূর দাস পরমানন্দ
প্রেম ভক্তি রতন কে হার ॥৩॥

কৃষ্ণকে একা পেয়ে রাধারও বড় অহংকার হল। আমি তাহলে অন্য গোপীদের চাইতেও সৌভাগ্যবতী যে শ্যামকে একা পেলামতাই শ্রীরাধিকা শ্যামকে বললেন !, 'ওগো শ্যাম, আমার প্রাণাধিক, এতখানি হেঁটে এসে আমি বড় ক্লান্ত। আমার পা আর চলছে না। দয়া করে আমাকে তোমার কাঁধে তুলে নাও।' শ্যাম এবার মুচকি হাসলেন। 'এসো রাধে' বলে রাধাকে কোলে তুলে নিলেন। এবার পথিমধ্যে রইল শুধু শ্যামের পদচিহ্ন কিন্তু সে চিহ্ন যেন অধিক গভীর। হবেই তো, কানহা যে রাধাকে কোলে তুলে নিয়েছেকিন্তু এ সুখ রাধার কপালে সইল কি !? কিছুদূর এভাবে যাওয়ার পর শ্যাম আবার অন্তর্হিত হলেন।

'শ্যাম, শ্যাম, তুমি আমায় ফেলে কোথায় গেলে?'

রাধারাণী এ শোক সইতে পারলেন না। জ্ঞান হারালেন। সেই মূহুর্তে গোপীরা খুঁজতে খুঁজতে রাধাকে একা অচৈতন্য অবস্থায় পেয়ে অবাক হয়ে গেল। রাধার জ্ঞান ফিরলে তারা সকলে মিলে রোদন করতে করতে ফিরে গেল যমুনার তীরে। কৃষ্ণের ধ্যান করতে করতে তারা গাইতে লাগল গোপিকা গীত।

হে কৃষ্ণ, আমরা তোমার জন্য সব কিছুই ত্যাগ করলাম। লোক, লাজ, ভয়, কাম, অহংকার – সকলই ত্যাগ করলাম। আমাদের অন্তর জুড়ে শুধু তুমি। তুমি আমাদের হৃদয়ে আছো সখা। আমরা চিরকাল তোমাকে হৃদয়েই অধিষ্ঠিত করে রাখবো। শুধু তুমি দেখা দাও, নাথ, তুমি দেখা দাও। গোপীরা সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণের শরণাগত হল। শরণাগত। শরণাগত। হে প্রভু, তোমাকে ছাড়া আর কিছুই জানি না। তাদের দুচোখে দরদর অশ্রুধারা। অন্তর প্রেমে উদ্বেল।

এবার ভগবানের আসন টলল। কৃষ্ণ গোপীদের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। কি অপূর্ব রূপ তাঁর। রূপ থেকে যিনি গোপীদের অরূপে নিয়ে গেলেন – সেই নবদূর্বাদলশ্যামের গলায় বৈজয়ন্তীফুলের মালা, পরনে পীতবাস। মুখে

মধুর হাসি। কানহাইয়াকে দেখে গোপীদের চোখের পলক পড়ে না। তারা নবজীবন লাভ করল।পরমানন্দদাস লিখেছেন :

গোপী প্রেম কী ধ্বজা .
নিজ গোপাল কিতে আপনে
বাস উরাধার শ্যাম ভুজা ॥১॥
শুক মুনি ব্যাস প্রশংসা কিনি
উদ্ধ সন্ত সারাহি .
ভুরি ভাগ্য গোকুল কী বনিতা
অতি পুনীত ভবমানহি ॥২॥
কাঁহা ভায়ো জো বিপ্রকুল
জনম্য জো হরিসেবা নাহি .
সোই কুলীন দাস পরমানন্দ
জো হরি সম্মুখ ধ্যয়েই।

কাম জয় করে হল নিষ্কাম। নেতি নেতি নেতি নেতি ইতি। রাসলীলার মধ্য দিয়ে এভাবে পেল তারা অরূপরতন। রূপসাগরে ডুব দিয়ে অরূপরতন খুঁজে পাওয়া। ভগবান কারো একার নন। তিনি সকলের। তাই এক কৃষ্ণ বহু হলেন। রাসলীলা করলেন গোপীদের সঙ্গে।

এই হল ভারতীয় দর্শন। প্রেমের মধ্য দিয়ে আমরা ভগবানেরই জয়গান গাই। এ প্রেম আমাদের স্বর্গীয় আনন্দ দেয় ইংরেজীতে যাকে বলে ecstasy বা পরমানন্দ। আগামী উনিশে নভেম্বর রাস পূর্ণিমা। তাই এই দিনটির তাৎপর্য ফুটিয়ে তোলার একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা করলাম মাত্র।

মঙ্গল মাধো নাম উচার।
মঙ্গল বদন কমল কর মঙ্গল
মঙ্গল জান কী সদা সম্ভার ॥১॥
দেখত মঙ্গল পূজত মঙ্গল
গাবত মঙ্গল চরিত উদার
মঙ্গল শ্রবণ কথা রস মঙ্গল
মঙ্গল তনু বাসুদেব কুমার ॥২॥
গোকুল মঙ্গল মধুবন মঙ্গল
মঙ্গল রুচি বৃন্দাবন চাঁদ .

মঙ্গল করত গোবর্ধনধারী
মঙ্গল বেশ যশোদা নন্দ ॥৩॥
মঙ্গল ধেনু রেণু ভূ মঙ্গল
মঙ্গল মধুর বাজাবত বেন .
মঙ্গল গোপবধূ পরিবনবান
মঙ্গল কালিন্দী পায় ফেন ॥৪॥
মঙ্গল চরণ কমল মুনি বন্দিত
মঙ্গল কী রাতি জগৎ নিবাস .
অনুদিন মঙ্গল ধ্যান ধরত
মুনি মঙ্গল মতি পরমানন্দ দাস ॥৫॥

পরমানন্দ দাসজীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি :
****

পরমানন্দ দাসের জন্ম মোটামুটি ১৫৫০ বিক্রম সম্বৎ (ইং ১৪৯৩)এর আশেপাশে হয়েছিল উত্তর প্রদেশের কনৌজে এক নির্ধন দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে হয়েছিল।তিনি যেদিন জন্মগ্রহণ করেন, সেদিন এক ধনী ব্যক্তি ওনার পিতাকে অনেক ধন দান করেছিলেন। দানের পরিণাম স্বরূপ ওনার পিতৃগৃহ পরম আনন্দে ছেয়ে যায়, সেকারণে পিতা বালকের নাম রাখেন পরমানন্দ।ওনার বাল্যাবস্থা সুখপূর্বক ব্যতীত হতে থাকে।ছোট থেকেই ওনার স্বভাবে

ত্যাগ আর উদারতার বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়।ওনার পিতা সাধারণ শ্রেণীর ব্যক্তি ছিলেন। দান আদির মাধ্যমেই তিনি আপন জীবিকা নির্বাহ করতেন।

এক সময় কনৌজে আকাল উপস্থিত হয়।হাকিম দণ্ড হিসেবে ওনার পিতার সারা ধন ছিনিয়ে নেন আর ওনারা কাঙাল হয়ে যান।পরমানন্দ তখন পূর্ণ যুবকাবস্থা ।তখনো তার বিবাহ হয় নি।পরমানন্দের পিতার সবসময় ওনার বিবাহের চিন্তা হত আর পরমানন্দ তাঁকে বলতেন আপনি আমার বিবাহ নিয়ে চিন্তা করবেন না"-, আমি বিবাহই করবো না। যা কিছু আছে তাই দিয়ে আপনি পরিবার প্রতিপালন করুন, অতিথি সৎকার করুন, সাধুসেবা করুন।কিন্তু ওনার পিতার দ্রব্য উপার্জন করার ইচ্ছে ", তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন, দেশ বিদেশে ঘুরতে থাকেন। পরমানন্দ দাস যুববস্থাতেই ব্রজভাষার কবি ও কীর্তনকার হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।লোকে ওঁকে পরমানন্দ স্বামী বলে সম্বোধন করতেন ।ছাব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত উনি কনৌজে ছিলেন।

একবার উনি মকর স্নানের জন্য প্রয়াগে যান।তিনি সেখানে জলঘরিয়া ক্ষত্রি কাপুরের দর্শন আকাঙ্খায় আদেলে যান।সেখানে তিনি শ্রীমহাপ্রভু বল্লোভাচার্যকে যমুনার তীরে প্রথমবার দর্শন করেন। সেখানে বল্লোভাচার্যের সঙ্গে প্রয়াগের যমুনা তীরে মিলিত হলে তিনি শ্রীকৃষ্ণের বাল লীলাকীর্তন গাইতে থাকেন।শ্রী আচার্য্যজী তাঁকে দায়িত্ব

দেন বিভিন্ন সময় কীর্তন গেয়ে সেবা করতে শ্রীনবনিতপ্রিয়জীর সামনে । যখন শ্রী মহাপ্রভু বল্লোভাচার্য্য গোকুলে যান, শ্রী পরমানন্দজী তাঁর সঙ্গে যান এবং সেখানে তিনি শ্রীকৃষ্ণের বাল্য লীলার বিভিন্ন পদ রচনা করেন গোকুলে বসে।তিনি শ্রীবল্লোভাচার্য্যকে অনুরোধ করেন তাঁর সঙ্গে গোকুলে থেকে তাঁর সেবা করার অনুমতি দিতে।মহাপ্রভু তাঁকে গোকুলের গোবর্ধননাথজির সামনে কীর্তন সেবার অনুমতি দেন।যেহেতু ওনাকে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের বাল্য লীলার আনন্দের আস্বাদনের আশীর্বাদ করেন, তাই উনি শ্রীকৃষ্ণের কয়েক হাজার বাল্য লীলার গোপন অনুভূতির কীর্তনের পদ রচনা করেন।উনি ছিলেন সমর্থ কবি, কুশল সংগীতজ্ঞ এবং ভাবপ্রবণ কীর্তনকার।ওনার ভাব ব্যঞ্জনার প্রভূত মাধ্যম ছিল সঙ্গীত।প্রত্যেক প্রসঙ্গের অনুভূতিকে উনি বিভিন্ন রাগ রাগিনীর স্বরূপে দক্ষতার সঙ্গে সাজিয়ে গেয়ে পরিবেশন করেছিলেন।

পরমানন্দদাসকে অষ্টছাপ কবিদের মধ্যে বিরহ গানের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মানা হয়।উনি ওনার সময়ের প্রখ্যাত কীর্তনকার এবং পুষ্টিমার্গ সিদ্ধান্তের অনুরূপে আপন গায়নের পদের নির্মাণ স্বয়ং করতেন।শ্রীনাথজী পরমানন্দদাসজীর প্রাণাধার ছিলেন আর তাঁরই সেবা কীর্তনে উনি নিজের জীবনের সর্বস্ব সমর্পণ করে আজীবন ওনার লীলা গেয়ে গেছেন।ওনার ভক্তিরস ছিল বাল, কান্তা আর দাসভাবের।ওনার ভক্তি আর আস্থা আচার্য্য আর আরাধ্য দুই আধারেই সমান ছিল।

পরমানন্দদাসজী ছিলেন বল্লোভাচার্যের শিষ্য আর অষ্টছাপের প্রসিদ্ধ পুষ্টিমার্গের কবি। উনি ভগবানের লীলার মর্মজ্ঞ,অনুভবী কবি ও কীর্তনকার ছিলেন।উনি আজীবন ভগবানের লীলাকীর্তন গেয়েছেন।শ্রী বল্লোভাচার্যের ওনার প্রতি প্রভূত কৃপা ছিল।উনি পরমানন্দদাসজীকে ভীষণ সম্মান করতেন।ওনার পদ সমগ্র নামে " পরমানন্দ সাগর" খ্যাত।ওনার রচনা অত্যন্ত সরস আর ভাবপূর্ণ।লীলাগায়ক কবিদের মধ্যে ওনাকে অত্যন্ত গৌরবপূর্ণ স্থান প্রদান করা হয়ে থাকে।মূলতঃ মথুরা ছিল ওনার কর্মভূমি যেখানে উনি শ্রীকৃষ্ণ, গোবর্ধন, গোকুল বিষয়ক পদ রচনা করেন।

পরমানন্দের মৃত্যু ১৬৪১ বিক্রম সম্বত (১৫৮৪ ইং)তে সুরভিকুন্ড গোবর্ধন হয়।

দোলা মে ঝুলত হৈয় ব্রজনাথ।
সঙ্গ সহিত বৃষভননন্দিনী
ললিতা বিশাখা সাথ ॥১॥
বাজাত তাল মৃদঙ্গ ঝাঁঝ ডাফ
রুয়াঞ্জ মুরাজ বহু ভান্ত .
অতি অনুরাগ ভরে মিল
গাবত অতি আনন্দ কিলাকাত ॥২॥
চুয়া চন্দন বুকবন্দন

উড়ত গুলাল আবীর.
পরমাননন্দ দাস বলিহারী
রজত হে বলবির ॥৩॥

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥